জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ❑ নবম বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা ❑ ৮ টাকা

মন্থন সাময়িকী

ব্যবসাভিত্তিক কৃষি ব্যর্থ হবেই — পৃষ্ঠা ২

বার্ড ফ্লু এবং ‘ধাড়ি মুরগি’র উপদ্রব — পৃষ্ঠা ৩

বিকল্প জৈবচাষ : একটি অভিজ্ঞতা — পৃষ্ঠা ১৮

বিকল্পের ভেনেজুয়েলা — পৃষ্ঠা ৯

আর একবার হিংসা–অহিংসার তর্ক — পৃষ্ঠা ২৬

চিঠিপত্র : — পৃষ্ঠা ২৯–৩০

১. বিষয় : বিকল্প লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা

২. বিষয় : খেজুরির ঘরছাড়া

পুস্তক পরিচিতি :

কয়লা ও পরমাণু দূষণ–মুক্ত বিদ্যুৎ

আমেরিকার জন্য বিকল্প পরিকল্পনা — পৃষ্ঠা ৩২

বড়ো পশুখামার, বেশি অসুখ

উচ্চ–প্রশংসিত খাদ্য বিষয়ক লেখক মাইকেল পোলান কয়েক বছর আগে লিখেছিলেন, আধুনিক ফ্যাকট্রি খামারের অবস্থা — যেখানে হাজার হাজার মুরগি, শুয়োর আর গরুকে একসঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে — তাঁকে মধ্যযুগীয় শহরগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। গাদাগাদি করা, নোংরা আর দুর্গন্ধময় এইসব ফ্যাকট্রি খামার রোগের উৎপত্তি আর প্রসারের পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে অধিক রোগবাহী E. coli (যা ১৯৮০–র দশকে গোবরের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল) আর H5N1 (মারণ এভিয়ান ফ্লু, যা ২০০৩ সাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে)। ফ্যাকট্রি খামার থেকে একইভাবে পশু ও মানুষের মধ্যে শ্বাসজনিত অসুখ হতে পারে। আর এইসব জায়গায় অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহারের কারণে অ্যান্টিবায়োটিক–প্রতিরোধ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলি এক বড়ো অপরাধী।

সোমবার ইউনাইটেড নেশন্‌স ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO) তাদের পক্ষে অবাক করার মতোই এক ভবিষ্যদ্বাণী করে — এইসব সমস্যা আরও খারাপের দিকে যাবে, কারণ মানুষ ও পালিত পশুর সংখ্যা বাড়ছে আর আমাদের মাংসের খিদেও বেড়ে চলেছে। এখন বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক বাস করে শহরাঞ্চলে আর দ্রুতই সেগুলি ফ্যাকট্রি খামারের গন্তব্য হয়ে উঠছে, বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে। ২০০৬ সালে মাংস উৎপাদন আড়াই শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ২৭৬০ লক্ষ টন আর তা ২০০৭–এ আরও ৩ শতাংশ বেড়ে ২৮৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে।

FAO–এর মতে, শিল্পগত পশুচাষের মধ্যে শুয়োর ও পোলট্রি হল দ্রুততম বেড়ে ওঠা ক্ষেত্র — শুয়োরের মাংসের উৎপাদন বেড়েছে ২.৬% আর পোলট্রি–উৎপাদন বেড়েছে ৩.৭%, শুধুমাত্র গত এক দশকে। আর যেহেতু আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে এইসব পশুবাণিজ্য চলেছে, রোগের বিপদ বাড়ছে।

অতীতে FAO, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা নানান কারণে শিল্পগত পশুচাষ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান করেছে। একটি কারণ হল, কৃষিতে বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আশির্বাদ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, এইসব সংগঠন বিশ্বাস করত, অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে এবং নিয়ন্ত্রিত তাপ ও আলোর ব্যবস্থায় গৃহমধ্যে পশু পালন করলে তারা রোগের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ক্রমাগত বেশি বেশি প্রামাণিক তথ্য কিছু রোগের প্রসারের উৎকেন্দ্র হিসেবে ফ্যাকট্রি খামারের দিকেই আঙুল তুলছে।

এখনকার মতো অন্তত দেখা যাচ্ছে, FAO তার সুর হয়ত পাল্টাচ্ছে। FAO–এর লাইভস্টক পলিসি এক্সপার্ট জোয়াসিম ওটে বলেন, “বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত পশুর চাপ পরিহার করা উচিত এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য উচ্চ বায়োসিকিউরিটি ও উন্নত রোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকল্পে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা দরকার”। ছোটো ছোটো খামার, আরও জিনগত বৈচিত্র্য এবং একই সঙ্গে খামারের শ্রমিক ও পশুদের জন্য আরও মানবিক ব্যবস্থা হয়ত রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো পথ হতে পারে।

ড্যানিয়েল নিরেনবার্গ, গবেষক, ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইন্সটিট্যুট, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭

মন্থন সাময়িকী আয়োজিত আলোচনাসভা

বিষয় : বিকল্পের ভেনেজুয়েলা

১ মার্চ ২০০৮ শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জর্জ ভবনে

[মৌলালি ডেন্টাল কলেজের পাশের গলিতে, BMPEU, ১৩/১ ক্রিক লেন, কলকাতা ১৪]

পত্রিকার পাঠক এবং এই বিষয়ে আগ্রহী বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ব্যবসাভিত্তিক কৃষি ব্যর্থ হবেই

মাসানোবু ফুকুওকা

ডঃ মাসানোবু ফুকুওকা ভারতে এসেছিলেন ১৯৮৭ সালের শেষদিকে। ভারত ভ্রমণকালে প্রয়াত পান্নালাল দাশগুপ্ত ছিলেন ওঁর সফরসঙ্গী। ওঁর সান্নিধ্যে এসে পান্নালাল দাশগুপ্ত লিখেছিলেন, "তাঁর চলাফেরা ও কথার পিছনে যেন একটা রহস্য (Mystic) আছে, বস্তুত ফুকুওকার দর্শনের মধ্যেই রহস্যের অবকাশ আছে। তিনি নিজে বিজ্ঞানী হয়েও বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যুক্তি ও দর্শনের সীমাবদ্ধতাও স্বীকার করেন।" ১৯৮৯ সালে পান্নালাল দাশগুপ্ত ফুকুওকার The One Straw Revolution বইটি বাংলায় প্রকাশ করেন। 'একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব, প্রাকৃতিক চাষের সম্ভাবনা' নামে এই বইটি অনুবাদ করেন রণজিৎ সেনগুপ্ত এবং নির্মল চট্টোপাধ্যায়। আমরা পত্রিকার এই সংখ্যার প্রাসঙ্গিকতার বিচারে এই বইয়ের একটি অংশ 'ব্যবসাভিত্তিক কৃষি ব্যর্থ হবেই' এখানে পুনর্মুদ্রণ করলাম, বানানের কিছুটা পরিবর্তন সহ।

ব্যবসাভিত্তিক কৃষির ধারণা যখন সর্বপ্রথম প্রকাশ করা হল, তখন আমি তার বিরোধিতা করেছিলুম। জাপানে বাণিজ্যভিত্তিক চাষ চাষির পক্ষে লাভজনক নয়। জাপানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ নিয়ম আছে যে যদি নির্ধারিত মূল্যে প্রথম খরিদকৃত কোন দ্রব্যের ওপর আবার নতুন প্রক্রিয়া চালু হয় তাহলে দ্রব্যটি বিক্রির সময় অতিরিক্ত খরচা যোগ করা হয়। কিন্তু জাপানী কৃষি ব্যবস্থায় এটা অতটা সরল ব্যাপার নয়। সার, রসদ, সাজসরঞ্জাম এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিদেশে নির্দিষ্টকৃত দামে কেনা হয়। তাই, যখন এসব আমদানীকৃত জিনিস ব্যবহার করা হয়, তখন পাউন্ড পিছু কত খরচা পড়বে, তা বলার অপেক্ষায় থাকে না। এটা সম্পূর্ণরূপে বণিকদের ওপরই নির্ভর করে। আর যদি বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে, চাষির আয় তার নিয়ন্ত্রণাতীত শক্তিগুলির ওপর নির্ভর করে।

সাধারণভাবে আমার কাছে বাণিজ্যিক কৃষি একটা নড়বড়ে ব্যাপার। **টাকা রোজগারের কথা না ভেবে নিজের প্রয়োজনে খাদ্য উৎপাদন করলেই চাষির অনেক বেশি মঙ্গল হবে।**

ধানের একটা দানা পুঁতলে, তা হাজার দানারও বেশি হয়ে যায়। একসারি শালগম থেকে সারা শীতের জন্য কাসুন্দি তৈরি করা যায়। চিন্তার এই পথ ধরে চললে, খুব পরিশ্রম ব্যতিরেকেই আপনার যথেষ্ট খাওয়া জুটবে — বলা যায়, প্রয়োজনাতিরিক্ত খাওয়া। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি আপনি টাকা রোজগারের জন্য সচেষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে লাভের মালগাড়িতে চেপে পড়ুন — আর ওই মালগাড়ি আপনাকে নিয়ে দূরে চলে যাবে।

সম্প্রতি আমি সাদা 'লেগহর্ণ'-এর বিষয়ে ভাবছি। কারণ উন্নত জাতের সাদা 'লেগহর্ণ' বছরে দু'শ দিনেরও বেশি ডিম পাড়ে। লাভের জন্য এদের পালন করা ভালো ব্যবসা রূপে বিবেচিত হয়। যখন ব্যবসার ভিত্তিতে এসব মুরগি পালন করা হয়, তখন কয়েদিদের কুঠরির মতো ছোটো ছোটো সারিবদ্ধ লম্বা খাঁচায় এদের আবদ্ধ করা হয়, আর, সারা জীবনে কখনও তাদের মাটিতে পা ফেলতে দেওয়া হয় না। এদের রোগ লেগেই আছে, বীজঘ্ন (Antibiotic) ওষুধ এদের দেহে ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে এবং হরমোন ও ভিটামিনের ব্যবস্থাভিত্তিক খাদ্য খাওয়ানো হচ্ছে।

বলা হয় যে, প্রাচীনকাল থেকে পালিত স্থানীয় মুরগি — বাদামি ও কালো রঙের স্যামো ও চ্যাবো — এদের ডিম পাড়ার ক্ষমতা ওদের চাইতে মাত্র অর্ধেক। এর ফলে এসব মুরগি জাপানে প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে। আমি দুটি মুরগি ও একটা মোরগকে পাহাড়ের ধারে বন্য অবস্থায় চরতে দিই। এক বছর বাদে ওদের সংখ্যা চব্বিশে দাঁড়াল। যখন মনে হয়েছিল খুব কম ডিম দিচ্ছে তখনই দেখা গেল স্থানীয় মুরগিরা তাদের বাচ্চাদের পালন করতে ব্যস্ত।

প্রথম বছরে লেগহর্ণের ডিম পাড়ার ক্ষমতা স্থানীয় মুরগির চাইতে বেশি থাকে। কিন্তু একবছর বাদে লেগহর্ণের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় এবং তাদের বাদ দিতে হয়। অথচ যে স্যামো মুরগি নিয়ে শুরু করেছিলুম, সেই মুরগি থেকে এখন দশটি সুস্থ মুরগি হয়েছে — এরা বাগানে এধারে ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশ থেকে আমদানি করা এবং কৃত্রিম উপায়ে সমৃদ্ধ খাদ্য দেওয়া হয় বলে সাদা লেগহর্ণ বেশ ভালো ডিম দেয়। আর ওই খাদ্য অবশ্যই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনতে হবে। স্থানীয় জাতের মুরগিরা চারধারে খুঁটে বেড়ায় এবং স্থানীয় এলাকায় যেসব বীজ ও পোকামাকড় থাকে তা স্বাধীনভাবে খেয়ে বেড়ায় এবং উপাদেয় ও স্বাভাবিক ডিম পাড়ে।

যদি মনে করেন যে বাণিজ্যিক শাকসবজি প্রকৃতির দান, তাহলে আপনাকে বিরাট বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে হবে। এসব শাকসবজি নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ এবং সামান্য বীজসহ এক জলীয় রাসায়নিক মিশ্রণ দিয়ে তৈরি। আর এদের স্বাদও ঠিক তেমনি। কৃত্রিম খাদ্য এবং রাসায়নিক ও হরমোনের মিশ্রণ ছাড়া বাণিজ্যিক মুরগির ডিম বেশি কিছু নয় (অবশ্য আপনার ইচ্ছে হলে ডিম বলতে পারেন)। এটা প্রকৃতির দান নয় — ডিমের আকারে মানুষের তৈরি কৃত্রিম পদার্থ মাত্র। যে চাষি এধরনের ডিম, শাকসবজি উৎপাদন করে, সে চাষিকে আমি প্রস্তুতকারকই বলি।

এখন, আপনারা যার সম্বন্ধে বলছেন, তা যদি নির্মাণকার্য হয়, তাহলে, লাভ করার ইচ্ছে থাকলে কিছু কাল্পনিক অঙ্ক কষতেই হবে। ব্যবসায়ী চাষি টাকা রোজগার করতে পারছে না, তার অবস্থা সেই ব্যবসাদারের মতো হয় — যে টাকা গুণে নেওয়ার মতো যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে না। এধরনের লোককে অন্য লোকেরা বোকা মনে করে। আর রাজনৈতিক ব্যক্তি ও বিক্রেতারা ওই চাষির মুনাফা হাতিয়ে নেয়।

প্রাচীনকালে যোদ্ধা, চাষি, শ্রমশিল্পী এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী ছিল। বাণিজ্য বা শিল্পের চাইতে কৃষিকেই বলা হত — সব জিনিসের উৎসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক। চাষিকে বলা হত "দেবতাদের পানপাত্র বাহক"।

কোন না কোনভাবে সবসময় সে সংগ্রহ করে আনতে পারত এবং তার খাওয়ার মতো জিনিস যথেষ্টই ছিল।

কিন্তু এখন টাকা রোজগারের জন্য উত্তেজনা চলছে। আঙুর, বিলিতি বেগুন (টমাটো) ও তরমুজের মতো হাল ফ্যাসানের উৎপন্নদ্রব্য ফলানো হচ্ছে। তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে (hot house) অকালের ফুল ফল জন্মানো হচ্ছে। মাছের কৃত্রিম প্রজনন চালু করা হয়েছে আর খুব লাভজনক বলে বেশ প্রজননও শুরু হয়েছে।

এই ধাঁচ সুস্পষ্ট রূপে এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে, যখন কৃষিব্যবস্থা অর্থনীতির জাহাজ চড়ে বাইরে পাড়ি দেয়, তখন কীই না ঘটে থাকে, দরের ওঠা-নামা সাঙ্ঘাতিক হয়। লাভ হয়, কিন্তু লোকসানও বেশ হয়।

এর ব্যর্থতা অনিবার্য। জাপানী কৃষিব্যবস্থা দিক ভুল করায় টলটলায়মান হয়ে পড়েছে। কৃষির মূল নীতিগুলি থেকে সরে গিয়ে ব্যবসাতে পর্যবসিত হয়েছে।

বার্ড ফ্লু এবং 'ধাড়ি মুরগি'র উপদ্রব

গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত

এখন চলছে বৃহদাকারে মুরগি নিধন। শুরুটা হয়েছিল বেশ নাটকীয়ভাবে : ২০০৭ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার মারগ্রামে ঝাঁকে ঝাঁকে মুরগির মৃত্যু শুরু হয়। গ্রামবাসীরা সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় বিডিও এবং ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিককে সে বিষয়ে জানায়। কিন্তু সরকারি আধিকারিক গ্রামবাসীদের কথায় কর্ণপাত করেননি। মারগ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানও এই অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ওই এলাকার মাহীপাড়ার মুরশেদ বিবি, তাঁর ২৮টি মুরগি মারা গেলে ২৮ ডিসেম্বর প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিককে সে খবর জানান। বিডিও এসময় বিষয়টা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান। কিন্তু ১৫ দিন পর জেলা থেকে সরকারি কর্মী এসে ভূপালের পরীক্ষাগারে পাঠানোর জন্য খামার থেকে মৃত মুরগির রক্ত ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিলম্বের কারণ হিসাবে জানান, তিনি ২৮ ডিসেম্বর বিডিওর ফোন পেলেও রোগটা বার্ড ফ্লু কিনা তা জানতেন না। ১৪ জানুয়ারি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। ব্যস! ১৬ জানুয়ারি ঘোষণা করা হল, মাহীপাড়ার ৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে সব মুরগি নিধন করতে হবে। ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ এলেও মহকুমাশাসক নিজে বার্ড ফ্লু বিশেষজ্ঞ নন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ফলে ইতিমধ্যে রোগের বিস্তার ঘটে গেছে বহুদূর — আর গ্রামবাসীরা একটু অসুস্থ মুরগিদের কেটে তাদের রসনা পরিতৃপ্ত করে। এখন প্রাণীসম্পদ বিভাগের অত লোক কোথায়? শ'তিনেক কেরানি এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীকে মাত্র একদিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে মুরগি নিধনের কাজে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যদপ্তর বিদ্যালয়ছুট শ'খানেক স্থানীয় কিশোর ও যুবককে কোন প্রশিক্ষণ বা থার্মোমিটার ছাড়াই দৈনিক শ'খানেক বাড়ির সদস্যদের তালিকা করে কার কার জ্বর হয়েছে সেই তথ্য সংগ্রহ করার এবং জানানোর কাজ দেয়। চুক্তিমতো দৈনিক পঞ্চাশ টাকা আর খাবার কিছুই এরা এখনও পায়নি। রাজ্য সরকার সীমানা রক্ষার কোন নির্দেশই দেয়নি, ফলে মানুষ ও মুরগিরা অবাধে ৫ কিমি ব্যাসার্ধের বাইরে চলাফেরা করেছে। পঞ্চায়েত ভোটের দিকে নজর রেখে প্রধান শাসক দল স্থানীয়ভাবে শুরুতে মুরগি নিধনের বিরোধিতা করে, পরে বেশি ক্ষতিপূরণের দাবি করে। এদিকে বহু গ্রামবাসী মুরগি নিধনের বিরোধিতা করে চলেছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের অভিযোগ, নির্দিষ্ট গ্রামকে আগাম কিছু না জানিয়েই নিধনকারীরা যখন তখন এসে মুরগি নিধন করতে চাইছে। তাতে গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়াচ্ছে। প্রথমদিকে নলহাটিতে, পরে অন্যত্র অনেক কর্মী প্রহৃত হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে সরে পড়েছে। খোদ বীরভূমের প্রথম রোগাক্রান্ত এলাকার রাজনৈতিক কর্মীরা দিশাহীনভাবে চলে তথাকথিত বিপদকে গোড়ার ২০–২৫ দিন পাত্তাই দেয়নি। প্রাণীসম্পদ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীরা বুড়ি-ছোঁয়া বৈঠক করে ভাষণ দিয়ে গেছেন। অন্য কোন উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা মন্ত্রী ঘুরবার সুযোগ পাননি। মোটের ওপর, দুটি জেলা থেকে ১২–১৪ জেলায় মুরগিরা দ্রুত আক্রান্ত। আর বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বা জুলুম করে মুরগি নিধনের কাজে প্রহৃত বা মৃতও কয়েকজন নিধনকারী। খবরে প্রকাশ, রোগগ্রস্ত মুরগির সংখ্যাও বেড়েই চলেছে, দেড়-দু' লক্ষ থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ।

বার্ড ফ্লু কী

২০০৪–এর ফেব্রুয়ারি মাসে এ রাজ্যে প্রথম ঘটা বার্ড ফ্লু নিয়ে মন্থন সাময়িকীর মার্চ–এপ্রিল ২০০৪ সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছিল। বিষয়টা একই আছে, তবে তার গভীরতা এবং অন্যান্য প্রভাব নিয়ে তখন ঠিকমতো আলোচনা করা যায়নি। সমস্যার ব্যাপকতাও এবার বেশি।

বার্ড মানে তো পাখি আর ফ্লু হল ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্ষিপ্ত নাম, দুয়ে মিলে এক ধরনের তীব্র এবং খুবই সংক্রামক রোগ–বীজ ঘটিত অসুখ। এর অপর নাম এভিয়ান ফ্লু, এভিয়ান অর্থাৎ পাখি সংক্রান্ত। বার্ড ফ্লুয়ের রোগ–বীজ বা জীবাণু অর্থোমিক্সোভাইরাস (ORTHOMYXOVIRUS) গণের তিনটি ধরন (Type), যথাক্রমে এ, বি ও সি থেকে ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জা ঘটে। এই ভাইরাসদের মধ্যেকার নিউক্লিওক্যাপসিড (NEUCLEOCAPSID) এবং এর বাইরের প্রোটিন আবরণের অ্যান্টিজেন[১] (ANTIGEN)–এর ফারাক পরিমাপ করে ঠিক কোন ধরনের ভাইরাস, তা নির্ণয় করা যায়। 'এ' এবং তার উপধরন (Subtype) থেকেই মূলত মানুষ, শূকর এবং মুরগিতে ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জা ঘটে। 'বি' ও 'সি' ধরন দুটি একমাত্র মানবদেহ থেকেই পাওয়া যায়। ওই 'এ'–র উপধরন যে কী এবং তার প্রভাব কতটা বা কত ব্যাপক তা এখনও সঠিক জানা যায়নি। ১৯৫৭ সালে সিঙ্গাপুরে যে উপধরনের জন্য মহামারী দেখা যায়, তা A/SINGAPORE/57/(H2N2) নামে পরিচিত, যা আগে STRAIN[২] A2 নামে পরিচিত ছিল। ১৯৬৮ সালে হংকংয়ের মহামারীর জন্য দায়ী উপধরনটি ছিল A/HONGKONG/1/68/(H2N2)। ২০০৪–এর ঘটনার জন্য দায়ী জীবাণুটি এবং অন্য ধরনের জীবাণুও কমবেশি — ৯০°C তাপমাত্রায় সংরক্ষণযোগ্য।

১৭৪৭–এ ইতালিতে প্রথম বার্ড ফ্লু মহামারী দেখা দেয়। ১৮৮৯ নাগাদ বিজ্ঞানী পিফাইফার হোমোফিলিস ইনফ্লুয়েঞ্জা খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি করেন। ১৯১৮–১৯ সময়কালে বড়ো রকম মনুষ্য মহামারী (Pandemic) দেখা দেয়। এতে পৃথিবীর প্রায় ৪–৫ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৫৭–৫৮ এবং ১৯৬৮–৬৯ সময়কালে আবার তার পুনরাবৃত্তি হয়। পিফাইফারের আবিষ্কারটি দেখা যায় দ্বিতীয় ধরনের। ১৯৩৩–এ স্মিথ, আমদ্রুস এবং লেইডল চিকিৎসাবিজ্ঞানের জীবাণুতত্ত্ব

---

[১] অ্যান্টিজেন হল এক ধরনের পদার্থ যা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে তা একটি অ্যান্টিবডি তৈরি করে নিতে শরীরকে প্রবৃত্ত করে। টক্সিন, ব্যাকটেরিয়া, বাইরের রক্তকোষ, প্রতিস্থাপিত অঙ্গের কোষ এই অ্যান্টিজেনের অন্তর্গত।

[২] আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ধরন ও উপধরন দেখেছি। সেগুলি আবার নানা স্ট্রেন-এ বিভক্ত। স্ট্রেন হল এক প্রজাতির অন্তর্গত এমন কিছু জীব যা একই ধরনের অন্য কিছু জীব থেকে সামান্য আলাদা।

আবিষ্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯৩৫–এ বার্নেট মুরগির ভ্রূণে ভাইরাস সংক্রমণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার শেষে টেলর ১৯৪৯–এ 'সি' ধরনটি আবিষ্কার করেন। এর প্রায় একদশক আগে 'বি' ধরনটি এবং তারও বছর দুয়েক আগে 'এ' ধরনটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। একমাত্র 'এ' ধরনটি H5N1 স্ট্রেন–এ হাঁস–মুরগি জাতীয় পাখি বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়। এ থেকে মানুষ ও অন্য প্রাণী আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যাপক বিশ্ববাণিজ্য বার্ড ফ্লুয়ের জীবাণুর দ্রুত সংক্রমণ ঘটায়। এ ছাড়া অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খামারে থাকা হাঁস–মুরগির মলমূত্র, কাটা মাংসের অবশেষাদি পরিবেশকে সহজেই দূষিত করে এবং দ্রুত জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়। এই জীবাণুর বাইরের দুটি গ্লাইকোপ্রোটিন (GLYCOPROTEIN) হল H, হেমাগ্লুটিনিন (HEMAGGLUTININ) আর N, নিউরামিনিডেস (NEURAMINIDES)।

H-N–এর বিভিন্ন উপধরনগুলি হল :

H1N1 : স্প্যানিশ ফ্লু, সাধারণ ফ্লু।

H2N2 : এশিয়ান ফ্লু।

H3N2 : হংকং ফ্লু, সাধারণ ফ্লু।

H5N1 : সমগ্র পৃথিবী সবচেয়ে ক্ষতিকর জীবাণু, যা দ্রুত সংক্রমণ ঘটায়।

H7N7 : এপর্যন্ত একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

H1N2 : সাধারণ ফ্লু।

H9N2 : তিনজন মানুষের সংক্রমণ ঘটেছিল।

H7N2 : দুজন মানুষের সংক্রমণ ঘটেছিল।

H7N3 : দুজন মানুষের সংক্রমণ ঘটেছিল।

H10N7 : দুজন মানুষের সংক্রমণ ঘটেছিল।

ভাইরাস–প্রতিষেধক (Vaccine) তৈরির অসুবিধা কোথায়?

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, H5N1 ভাইরাসটি থেকে যে সংক্রমণ মনুষ্য তথা মনুষ্যেতর প্রাণীদেহে ঘটে, তাতে এর RNA[৩] দ্রুত বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন নতুন ভাইরাসে রূপান্তরিত হয়ে প্রাণীদেহে সংক্রামিত হয়। সাধারণভাবে ভাইরাসের রোগবাহিতা তিন ধরনের হতে পারে : এনডেমিক (Endemic) বা আঞ্চলিক রোগ, এপিডেমিক (Epidemic) বা মহামারী এবং প্যানডেমিক (Pandemic) বা বড়ো রকম মনুষ্য মহামারী। H5N1 সেই ধরনের অধিক রোগবাহী (Highly Pathogenic) ভাইরাস। কম রোগবাহী ভাইরাসও বিশ্লিষ্ট হয়ে অধিক রোগবাহী হয়ে উঠতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৮৩–৮৪) এবং মেক্সিকোতে (১৯৯২–৯৫) সেরকম ঘটেছিল। ভ্যাকসিন বা ভাইরাস–প্রতিষেধক ব্যবহার করে অসুস্থতার নিরাময় হতেও পারে, কিন্তু ভাইরাসের রোগবাহিতা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কারণ ভ্যাকসিন কোন মামুলি অ্যান্টিভাইরাল নয়। ভাইরাস এবং তার সামগ্রিক প্রভাব বা সংক্রমণকে প্রতিরোধ করতে গেলে তিনমাস সময় লাগে এর পরীক্ষার জন্য, অধিক রোগবাহী ভাইরাস সেই সময়ের মধ্যেই বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন ভাইরাসে রূপান্তরিত হয়। তাই আঞ্চলিক রোগের ক্ষেত্রেই ভ্যাকসিন কার্যকর। বার্ড ফ্লুয়ের সম্ভাবনা দেখলে বাছাই করে পাখিগুলিকে মেরে ফেলাই এখনও পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO–এর মতে আদর্শ পন্থা।

মনুষ্যদেহে বার্ড ফ্লু রোগের জন্য প্রথম প্রতিষেধক উদ্ভাবন করে মার্কিন ড্রাগ ফার্ম গিলিড সায়েন্সেস (Gilead Sciences)[৪]। তারা এর পেটেন্ট নিয়ে সুইশ কোম্পানি রোশে (ROCHE)–কে উৎপাদনের সম্পূর্ণ অধিকার দেয়। রোশে ট্যামিফ্লু (Tamiflu) বা অসেলটামিভির (OSELTAMIVIR) নামে রোগ–প্রতিষেধক চালু করে WHO–কে দেয়। কিন্তু WHO–র বিশেষজ্ঞ হাসান আল–বিউস্ত্রা তা ব্যবহারে অনাস্থা প্রকাশ করেন।

মুরগি খাওয়ার বিপদ

চিকিৎসকদের সংস্থা আইএমএ জানাচ্ছে, ৭০°C–এর বেশি তাপমাত্রায় মুরগির ডিম বা মাংসে জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় এবং তা আহার করা যেতে পারে। আমাদের দেশের তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এসব না জেনেই এমনকি রোগগ্রস্ত মুরগিও খেয়ে চলেছে, তেমন কিছু ঘটেছে বলে জানা যায়নি।

৩ জানুয়ারি ২০০৮, একটি তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ২০০৩–২০০৭ সময়কালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৩৪৮ জন এতে আক্রান্ত হয়েছে, মৃত্যু ঘটেছে ২১৬ জনের। আর এশিয়ায় ১৫২ জন আক্রান্তের মধ্যে মারা গেছে ৭১ জন। এখন এবিষয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য–পরিষেবা সংস্থার বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, H5N1–এর জীবাণু সম্পর্কে যা গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে, তাতে এখনও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। তবে HIV রোগে বা গাড়ি দুর্ঘটনায় যত লোকের মৃত্যু ঘটে, তার তুলনায় বার্ড ফ্লুয়ের মারণক্ষমতা অনেক কমই টের পাওয়া গেছে। আর মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও তো বোধহয় অতুলনীয় হারে বেড়ে চলেছে। সেখানে রোগাক্রান্ত মুরগির মাংস বা ডিম খাওয়া এবং খেয়ে অসুস্থ হওয়া তো কোটিতে গুটিক।

সহস্র জীর্ণ সংস্কারে আবদ্ধ থেকেও গরিব মানুষ হাঁস মুরগি ছাগল নিয়ে বসবাস করে। অনেক অর্থেই সেগুলি তাদের অসময়ের সম্বল। এ অবস্থায় পাইকারি হারে মুরগি নিধন তাদের কাছে আতঙ্কবিশেষ। রোগগ্রস্ত হলেও সে মুরগি জবাই করে গ্রামশহর সর্বত্র বিক্রি হয়ে চলেছে। শুধু মুরগি কেন, অন্যান্য মাংস–মাছ এভাবেই মানুষের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। যদিও অত্যন্ত সচেতন সমাজ–সংস্থা নিরামিষ ভোজনে তৃপ্ত থাকার জন্য নিরন্তর আবেদন জানিয়ে আসছে — এমন কথাও বলা হচ্ছে, মাছ–মাংস–ডিম সবই ত্যাগ করা উচিত শতসহস্র কারণে। কারণগুলিও উদ্দীপক। কিন্তু ওকথা শুনে কি তাবৎ পৃথিবীর মানুষ রাতারাতি খাদ্যাভ্যাস বদলায়?

ধাড়ি মুরগির উপদ্রব[৫]

১৯৫০ থেকে [বিশ্বে] মাংসের উৎপাদন পাঁচগুণ বেড়ে গেছে। মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। অর্থাৎ অনেক বেশিসংখ্যক মানুষের খাবার জোগাতে

---

[৩] রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষেপ RNA। বার্ড ফ্লুয়ের মতো কিছু ভাইরাসে RNA হল নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রধান জিন–পদার্থ ও কোড।

[৪] মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি ডোনাল্ড রাম্‌সফেল্ড এই কোম্পানির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং এখনও একজন বোর্ড সদস্য ও শেয়ারহোল্ডার। ২০০৫–এর নভেম্বরে বুশ ট্যামিফ্লু বিক্রির জন্য ১.৪ বিলিয়ন ডলার সরকারি সাহায্য ঘোষণা করেন।

[৫] টাইসন, কেন্টাকি চিকেনের মতো ফরাসি বহুজাতিক মুরগি ব্যবসার নাম 'বিগ চিকেন', আক্ষরিক অর্থে ধাড়ি মুরগি, ভাবার্থেও তো তাই–ই।

হচ্ছে। শহরায়ন বেড়েই চলেছে এবং আগামী বছরের মধ্যে [২০০৭] মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গ্রামের তুলনায় শহরে বেশি মানুষ থাকবে। শহরায়ন ও আয়বৃদ্ধির পরিণামে আরও বেশি মানুষ খাবারে মাংস জোটাতে পারবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপ ফ্যাকট্রি উৎপাদনের শীর্ষে রয়েছে। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিধিনিষেধের কড়াকড়ির ফলে এবং যেহেতু পশুমঙ্গল আরও বেশি একটা ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে, আমার মনে হয় মানুষের চেতনার একটা বদল ঘটতে শুরু করেছে যে, কীভাবে মাংস উৎপাদন হচ্ছে। আরও সহনশীল মানবিক উৎপাদনের দিকেও একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিকে উন্নয়নশীল দুনিয়ায় মাংসের উৎপাদন অন্য যে কোন জায়গার তুলনায় বেশি হারে বাড়ছে। সেখানে এই চেতনা অনুপস্থিত। কারগিল, স্মিথফিল্ড এবং মাংস উৎপাদনের অন্য বড়ো কারবারীরা এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা আর চেতনার অভাবের সুযোগটা নিচ্ছে। এরা নিজেদের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের পরিকাঠামো কেবল মেক্সিকোতেই নয়, বরং পোল্যান্ড, ভারত, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন্স এবং অন্যত্রও গড়ে তুলছে। একাজে এরা স্থানীয় মানুষের বাধা তেমন পায়নি।

... [উন্নয়নশীল দুনিয়ায় ফ্যাকট্রি ফার্ম] মানুষকে — তার নিজের জমিতে অথবা যে জমিতে সে কয়েক দশক ধরে বাস করে এসেছে — ভূমিদাসে পরিণত করল। ... ডেলমার্ভা উপদ্বীপে আমেরিকার বহু মুরগির উৎপাদন হয়। সেখানে চাষিদের মুরগির ওপর স্বত্ব নেই, কিন্তু নিজেদের জমির ওপর বিশাল সব ফ্যাকট্রি ফার্মে মুরগি পালন করে তারা পয়সা পায়। একই নজির গড়ে তোলা হয়েছে থাইল্যান্ডের মতো দেশে। সেখানে 'টাইসন'-এর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেছে সবচেয়ে বড়ো মুরগি উৎপাদক। সে আমেরিকার 'ভার্টিকাল ইন্টিগ্রেশন'-এর মতো এত "সফল" পদ্ধতি নিয়েছে। মুরগির সমস্ত খাদ্য এবং প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা তার মালিকানায় রয়েছে। সে একগুচ্ছ ঠিকা চাষি নিয়োগ করেছে যারা তার হয়ে মুরগি পালন করে। ...

ছোটো চাষিরাও অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবে আরও পারদর্শী হয়ে উঠছে, কিন্তু তারা উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। বড়ো মুরগি আর শূকর কোম্পানিরা ঢুকছে এবং বাজারে একচেটিয়া দখল কায়েম করছে। আর যখন এভিয়ান ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু কিংবা অন্য অসুখ আক্রমণ করছে, এইসব বড়ো ফার্মগুলি — এরাই প্রায়শ এইসব অসুখের উৎস — ছোটো ফার্মগুলির তুলনায় তাড়াতাড়ি সেই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে থাইল্যান্ডে এটাই ঘটেছে। যেই এভিয়ান ফ্লু এল, বড়োরা তাদের ফার্মগুলি সাফ করে ফেলল। মুরগিগুলো রপ্তানি করে দিয়ে পরদিন থেকেই উৎপাদন শুরু করে দিল। এটা ছোটো ফার্মের পক্ষে খুব মুশকিল। তাদের কেউ কেউ নিজেদের জমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরে পাড়ি দিল। এ হল চাষীদের এক গোটা প্রজন্মকে সাফ করে দেওয়ার কাহিনী আর বহু দেশে এটাই দাঁড়িয়েছে সামগ্রিক জীবনযাপনের চেহারা।

'ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইন্সটিটিউট'-এর গবেষক ড্যানিয়েল নিরেনবার্গের সঙ্গে সঞ্জমিত্রা আয়ারের সাক্ষাৎকারের অংশ, 'সত্য', নভেম্বর ২০০৬।

পশ্চিমবঙ্গে মুরগি নিধন চলছে। জানা-অজানার মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা মুরগি নিধনযজ্ঞের ছবি দেখছি কাগজে, টিভির পর্দায়। এক দুঃসময়ের ইঙ্গিত পাচ্ছি। বার্ড ফ্লু নিয়ে খবরের কাগজে দেখছি একই সঙ্গে সরকারি আর বেসরকারি বিজ্ঞাপন। কী দেখছি? একদিকে, গ্রামেগঞ্জে মফস্বলের পাড়ায় গৃহস্থের উঠোনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে নিধনকর্মীরা। অন্যদিকে, 'ন্যাশনাল এগ কো-অর্ডিনেশন কমিটি' লিখছে, "১ সেকেণ্ডের জন্য মাত্র ৭০°সে. তাপমাত্রায় গরম করলেই ভাইরাস মরে যায়। তাই তো রান্না করা চিকেন বা ডিম খেয়ে কখনও মানুষজনের মধ্যে বার্ড ফ্লু (H5N1) ছড়ায়নি।" সব মিলিয়ে আতঙ্কের এই পরিস্থিতিতে একরাশ বিভ্রান্তির আয়োজন।

স্বভাবতই জানা দরকার হয়ে পড়ছে, কারা এই 'ন্যাশনাল এগ কো-অর্ডিনেশন কমিটি'? তাদের বিজ্ঞাপনের একপাশে একটা ব্র্যান্ড লোগো রয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে Vencobb। আর সরকারি বিজ্ঞাপন ও প্রচার ইঙ্গিত করছে আমাদের চিরাচরিত ঘরোয়া মুরগি পালন এবং ছোটো পোলট্রির দিকে। এমনকি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব তো বলেছেন, "কোনও নামী পোলট্রি ছাড়া বাড়িতে বা অন্যত্র পালন করা মুরগি এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাঠানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জানুয়ারি ২০০৮] ছাড়প্রাপ্ত ১৪টি কোম্পানির কথাও সংবাদপত্রে এসেছে। তাহলে এটাও জানা দরকার হয়ে পড়ছে, নামী পোলট্রি কেন ছাড় পাচ্ছে?

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ ভারত সরকার মহারাষ্ট্রের নন্দারবার জেলার নবপুর তালুককে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হিসেবে ঘোষণা করেছিল। নবপুরে ৫২টি বড়ো পোলট্রি ফার্ম এবং প্রায় ১৪ লক্ষ ডিম-পাড়া মুরগি ছিল। ১৫ জানুয়ারি থেকে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে একটি ফার্ম, 'ডায়মন্ড পোলট্রি ফার্ম'-এর ৭০,০০০ মধ্যে ৫৫,০০০ মুরগি মারা যায়। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরকে তা কেন জানানো হয়নি জানতে চাইলে, নন্দারবারের কালেক্টর জয়ন্ত গায়কোয়াডকে 'ভেঙ্কটেশ্বর হ্যাচারিজ'-এর প্রধান অনুরাধা দেশাই বলেন, মৃত মুরগির নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেগুলি 'রানীখেত' নামে এক সাধারণ ভাইরাস থেকে মারা গেছে। ওই ভাইরাস থেকে মানুষের সংক্রামিত হওয়ার ভয় নেই। প্রসঙ্গত, অনুরাধা দেশাই 'ন্যাশনাল এগ কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র সভানেত্রী। নবপুরের ৯৫% পোলট্রির মালিকানা 'ভেঙ্কটেশ্বর হ্যাচারিজ'-এর। এরাই চাষিদের প্রধান সরবরাহকারী। শুধু মুরগি নয়, মুরগির ওষুধ, খাবার, ভ্যাকসিন ইত্যাদি সরঞ্জাম এরাই সরবরাহ করে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া পুনার 'ওয়েস্টার্ন রিজিওনাল ডিজিজ ডায়াগনিস্টিক ল্যাবোরেটরি'র ১৬ ফেব্রুয়ারির রিপোর্ট এই তথ্যকে সমর্থন করে। অথচ ১৮ ফেব্রুয়ারি ভূপালের 'হাই সিকিউরিটি এনিমাল ডিজিজেস ল্যাবোরেটরি' মৃত মুরগির নমুনায় H5N1-এর উপস্থিতি অর্থাৎ বার্ড ফ্লু রিপোর্ট করে 'সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব এনিমাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ডেয়ারিং'-কে।

এশিয়াতে অধিক রোগবাহী H5N1 ভাইরাস প্রথম চিহ্নিত হয়েছিল ১৯৯৬-তে চীনের গুয়াঙদঙ প্রদেশে, SEZ-এর জন্য যার বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি রয়েছে। সেখানে কিছু হাঁস মারা গেল, কিন্তু তেমন আমল দিল না কেউ। প্রথম সকলের নজর কাড়ল, যখন হংকংইয়ে ১৯৯৭ সালের মে মাসে পোলট্রি মার্কেট অঞ্চলের ১৮ জন আক্রান্ত হল এবং ৬ জন মারা গেল। অধিক রোগবাহী H5N1-এর উৎকেন্দ্র হয়ে উঠল চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া — ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া, লাওস, ইন্দোনেশিয়া — যেখানে ব্যাপক আকারে বদ্ধ ফ্যাক্ট্রি ফার্ম ব্যবস্থা অভুতপূর্ব হারে বেড়ে চলেছে। ভিয়েতনামে বার্ড ফ্লু ছড়ানোর জন্য দায়ী করা হয়েছিল সিপি (CHAROEN POKPHAND) নামক থাই বহুজাতিক কোম্পানিকে। এরা

ভিয়েতনামের ৮০% শিল্প-মুরগি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেন'-এর মতো এশিয়ার বৃহদায়তন ফাস্ট-ফুড চেইনগুলিকে সরবরাহ করে। ২০০৬ সালে ভিয়েতনামে সরকার এবং রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচীর অধীনে পোলট্রি ক্ষেত্রকে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পে পরিণত করার দশ বছরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

এশিয়ার এই সংকটকালে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (FAO) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বন্য ও পরিযায়ী পাখিদের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছে। কিন্তু এই রোগ ছড়ানোর মূলে রয়েছে অন্তর্দেশীয় পোলট্রি ব্যবসা, যা বহু মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী এবং ফার্মগুলির আবর্জনা অন্যত্র চালান করে দেয়। এধরনের উৎপাদন পদ্ধতিতে একই শেডের নীচে ছোটো ছোটো কুঠরিতে বদ্ধ অবস্থায় হাজার হাজার মুরগিকে পালন করা হয়। সহজেই ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়তে পারে। মুরগির খাদ্যে উচ্চ মাত্রায় অ্যান্টি বায়োটিক ব্যবহার করা হয়। দ্রুত হারে বৃদ্ধির জন্য গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করা হয়। সব মিলিয়ে মুরগির খারাপ ধরনের জিনগত পরিবর্তন ঘটে, পোলট্রির রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা কমতে থাকে। রোগ হলে অত বৃহৎ পরিসরে প্রয়োজনীয় নজরদারী রাখা যায় না। অথচ ঠিক আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রাণীসম্পদ ও বিকাশ দপ্তরের মতোই এই অন্তর্দেশীয় পোলট্রি শিল্প 'বায়োসিকিউরিটি'র ঢ্যাঁড়া পিটতে থাকে। অথচ বারবার ফ্যাকট্রি ফার্মগুলিতে বার্ড ফ্লু দেখা দিয়েছে : অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭৬, ১৯৮৫, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৭ সালে; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৩, ২০০২, ২০০৪-এ; ব্রিটেনে ১৯৯১-তে; হংকংয়ে ১৯৯৭, ২০০৩-এ; ইটালিতে ১৯৯৯-এ; চিলিতে ২০০২-এ; নেদারল্যান্ডসে ২০০৩-এ এবং কানাডায় ২০০৪-এ। নবপুরে ধরা পড়ে গিয়ে 'ভেঙ্কটেশ্বর হ্যাচারিজ'ও একই কায়দায় বায়োসিকিউরিটির কথা বলেছিল।

২০০৫ সালের অক্টোবরে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পোলট্রি কোম্পানিগুলি 'ইন্টারন্যাশনাল পোলট্রি কাউন্সিল' গঠন করেছে। এছাড়া 'ইন্টারন্যাশনাল এগ কমিশন' নামে এক কর্পোরেট লবি গোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে। এদের কাজ হল FAO ও WHO-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দেশে দেশে সরকারগুলিকে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করা। আজ তো পশ্চিমবঙ্গে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অসুখের উৎসটাকে ছেড়ে দিয়ে তার শিকার গৃহপালিত হাঁস-মুরগিকে তাড়া করে কোতল করা হচ্ছে। ধাড়ি মুরগির এই উপদ্রব আমরা কতদিন সহ্য করব?

★ এই প্রবন্ধে সমস্ত পাদটীকা সংযোজন করেছেন পত্রিকা সম্পাদক।

সূত্র :

১. মন্থন সাময়িকী, মার্চ-এপ্রিল ২০০৪।

২. Influenza : A Virus Subtype H5N1 from WIKIPEDIA.

৩. What's Wrong with Eating Meat : 50 Reasons, Consumers Association of Penang.

৪. Health-Asia : Four Years on Questions Hover on Bird Flu, Jaime Lim - Newsmekong.

৫. Avian Influenza ("Bird Flu") and the Significance of its Transmission to Humans, WHO.

৬. Bird Flu --- the Imminent Plague.

৭. Who flew? Is Influenza Afflicting Government?, Down To Earth, 15 March 2006.

৮. Fowl Play : The Poultry Industry's Central Role in the Bird Flu Crisis, GRAIN, February 2006.

বিকল্প জৈব চাষ : একটি অভিজ্ঞতা

ভরত মানসাটা

আমরা তিন-চারজন মিলে ঠিক করলাম, জৈব চাষ করব। জৈব চাষের মধ্যে মূলত ফল আর সবজিতেই আমাদের আগ্রহ ছিল। তারপর জায়গাটা দেখলাম জঙ্গলের মতো। আগে ওই এলাকায় খুব ভালো জঙ্গলই ছিল। ওখানকার লোকেরা প্রথমে কেটে চারকোল বানাত। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুনরায় যে বৃদ্ধি হত, সেটা কেটে ওরা জ্বালানি বানাত। আমরা যখন জায়গাটা কিনলাম, তার আগের চার-পাঁচ বছর গাছপালা বেড়েছে। কাটবার সময় হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার ১৩ বছর গেছে। সব মিলিয়ে এখন প্রায় ১৮-২০ বছর ধরে গাছগুলো বেড়েছে।

১৯৮৪ সালে আমি ফুকুওকার 'একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব'[১] পড়েছিলাম। ১৯৮৭ সালের শেষের দিকে তিনি এদেশে এসেছিলেন। ওই বইটা পড়ে অর্গানিক ফার্মিংয়ে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে একটু লেখালেখি শুরু করি। ১৯৮৯-এ Ecological Vision বলে একটা বই লিখি। পরিবেশের বিষয়ে একটা সাধারণ ভূমিকার সঙ্গে ওতে organic ecological agriculture নিয়েও কিছুটা লিখেছিলাম।

অর্গানিক (জৈব) আর ন্যাচারাল (প্রাকৃতিক) চাষের মধ্যে একটা তফাত করা উচিত। যেখানে আমরা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করি না, সেটাকে অর্গানিক বলা যায়। ভাস্কর সাভে যাকে প্রাকৃতিক চাষ বলেন, সেখানে মানুষের কিছু করার দরকার পড়ে না। যেমন, জঙ্গল পুরোপুরি প্রাকৃতিক, মানুষ সেখানে কিছু করতে যায়নি। ফুকুওকা প্রাকৃতিক চাষ আরম্ভ করেছিলেন পুরনো জমিতে, মাটিকে তিনি বিব্রত করতেন না। সেটা ছিল অর্গানিকের থেকেও একটু এগিয়ে থাকা, কর্ষণহীন চাষ। তিনি যেটা করতেন, তাকেও বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক চাষ বলা যায় না। কারণ সেখানেও তো গাছ লাগাতে হয়, ফসল কাটতে হয়, গোড়া নিড়াতে হয়, নানারকম কাজ থাকে। শুধু ভূমিকর্ষণ হয় না। জাপানে তো নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বৃষ্টিপাত বেশ সমবন্টিত। তাই মাঠের মধ্যে সবসময় ফসল রাখা সম্ভব। একটা ফসল কাটার আগে অন্য রোপন শুরু হয়ে যেত। মাটি সবসময় নরম থাকত। এখানে তো চার মাস বৃষ্টির পর আস্তে আস্তে শুকিয়ে তিন-চার মাসের মধ্যে মাটি একেবারে কঠিন হয়ে যায়। তখন বীজগুলো আর জলকে ধরতে পারে না। তাই মাটিকে নরম করে নিতে হয়। ফুকুওকার কর্ষণহীন প্রাকৃতিক চাষ সেই

[১] **মাসানোবু ফুকুওকা'র The One Straw Revolution বই।**

কারণে ভারতে খুব বেশি সফল হয়নি। তামিলনাড়ু ইত্যাদি কয়েক জায়গায় যেখানে বছরে দুবার বৃষ্টি হয়, সেখানে কিছুটা সফল হয়েছে। সেচ নিয়ে ওটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ভাস্কর সাভে বলেন, একটা সমস্যা থেকে বাঁচতে আমরা সেচযুক্ত চাষ করি, সেটাও আর একটা সমস্যা তৈরি করে। কারণ বৃষ্টির জল ছাড়া যতরকম জল — কুয়োর জল, পুকুরের জল, খালের জল — মাটির সংস্পর্শে থাকে, তাতে মাটি মিশে থাকে। সেচের সময় যদি মাটিতে নিষ্কাশনের পথ না থাকে আর বাষ্পীভূত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাহলে বিশুদ্ধ জলটা বাষ্পীভূত হয়ে জলের লবণ ওপরে থেকে যায়। ক্রমাগত তা জমিকে লবণাক্ত করে দেয়। আমরা যে ইরাক, মেসোপটেমিয়ার কথা বলি, কৃষি তো ওইসব জায়গায় খুবই উন্নত ছিল। একসময় ভালো ক্যাশক্রপ হত, উদ্বৃত্ত ফসল বাইরে যেত। সেচযুক্ত চাষ করে করে এবং ব্যাপক হারে বাষ্পীভবনের ফলে ওই জায়গাগুলো মনুষ্য-সৃষ্ট মরুভূমিতে পরিণত হল। ধীরগতিতে হলেও এটা ক্ষতিকর। তাই সেচের ব্যবস্থা নিয়ে ভূমিকর্ষণহীন চাষ আর একটা সমস্যা তৈরি করে।

ভাস্কর সাভে যে পদ্ধতিতে জমিতে শস্যচাষ করেন, সেটাকে তিনি জৈব চাষ বলেন, কেননা সেখানে কিছুটা মানুষের হস্তক্ষেপ দরকার। রাসায়নিক ব্যবহার করেন না তিনি। তবে মানুষের হস্তক্ষেপের জন্য ওটাকে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক চাষ বলা যায় না। কিন্তু বৃক্ষরোপনের জন্য প্রথম একবার মাটি আলগা করে নিয়ে তিনি গাছটা রোপন করে দেন। খুব তাড়াতাড়ি মাটিটা সবুজ হয়ে ওঠে। তারপর আর মাটিকে কর্ষণ করা হয় না। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক চাষ কথাটা সবচেয়ে উপযুক্ত। অনেকটা আমাদের ঘরের বাচ্চাদের মতো। প্রথমে ওদের একটু দেখতে হয়, তারপর নিজেরাই নিজেদের সামলে নেয়।

জৈব চাষকে আমরা সবসময় পরিবেশের পক্ষে অনুকূলও বলতে পারি না। বাণিজ্যিক জৈব চাষ যেটা হচ্ছে, বাজারে বিক্রি বা রপ্তানির জন্য, ওখানেও দু-তিনটে সমস্যা হয়। এক তো জৈব সামগ্রী আশপাশ থেকে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করার ফলে অন্যত্র কম পাওয়া যায়। আর এতে 'মোনোকালচার'-এর ব্যাপার চলে আসে। অর্থাৎ যে জিনিসে ভালো দাম পাওয়া যায়, সেই একই জিনিস বেশি বেশি চাষ করা হয়। সবরকম মিলিয়ে মিশিয়ে চাষ করা হয় না। কারণ কুড়ি রকম ফসল দু-চার কেজি করে নিয়ে মার্কেটিংয়ের খুব ঝামেলা। অথচ এক ফসল দু'শ কেজি হলে মার্কেটিংয়ে সুবিধা। আর তাছাড়া বহু ফসল তো এক সঙ্গে ফলে না। অল্প অল্প পরিমাণে বারেবারে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা। তাই মিশ্র-চাষে এখানে অসুবিধা হয়। বাণিজ্যিক জৈব চাষ তাই পরিবেশের পক্ষে ভালো নয়। এরা 'মোনোকালচার'এর দিকে যায়। তার ফলে ওই গাছ একই খাদ্য জমির একই স্তর থেকে নিয়ে নেয়। তার অভাব তৈরি হয়। গাছ দুর্বল এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। 'মোনোকালচার'-এ পোকার উপদ্রব বেড়ে যায়। মিশ্র-চাষে একটা পোকা একটা জিনিস খায়, অন্য চাষে সেটা পায় না। ফলে পোকার উপদ্রব মিশ্রচাষের ফলে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

আমরা একটা ছোটো এলাকার মধ্যে চাষ করি। তাছাড়া আমাদের নিজেদের গোষ্ঠীটা বড়ো, আমাদের নিজেদের মধ্যেই জিনিসগুলো বিতরণ করি। এখন এবছর থেকে আমরা প্রচুর পেঁপে আর কলা পাব। এবার মার্কেটিংয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের একজন সদস্য আছেন, যিনি স্বাস্থ্য-শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য নিয়ে কাজ করেন। যতটা উদ্বৃত্ত হবে তিনি সবটাই নিতে চান। সবজি এখনও উদ্বৃত্ত হয়নি। তবে সামনে তাও হবে। যতটা জল পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী আমরা সবজি চাষ বাড়াব।

এটাও আমরা ভাস্কর সাভের পদ্ধতিতে করেছি। প্রথম একবার মাটি আলগা করে নিয়ে আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট চাষ করে নিয়েছি। যেখানে পেঁপে কলা লাগানো হয়েছে, সেখানে একটা সূর্যমণ্ডলের মতো আকৃতিতে লাগানো হয়েছে। ৯টা নারকেল ৯-১০ ফুট দূরত্বে লাগানো আছে। স্বাভাবিক দূরত্ব বেশিই হয়, ৩০-৩০ হয়। গাছের কাণ্ডটা নমনীয় হওয়াতে ওপরের দিকে উঠে এরকম বাইরের দিকে চলে যায়, একটা চাঁদোয়ার আকার ধারণ করে যাতে পুরো সূর্যের আলোটা নিতে পারে। তাই এভাবে গাছগুলো একটা ছোটো জমির মধ্যেও হয়। এর ভিতরে আমরা একটা কলাগাছের বৃত্ত করেছি আর বাইরে একটা পেঁপেগাছের বৃত্ত করেছি। মাঝখানের জায়গাটায় সব সবজি লাগানো হয়েছে। সবসময় জায়গাটা আচ্ছাদিত থাকার ফলে মাটি শক্ত হয়ে যায় না। তাছাড়া জঙ্গলের পরিবেশে আর্দ্রতাও বজায় থাকে। এই অংশটায় আমরা জলসেচও করি। পাশেই রকপুল, ওখান থেকে আমরা জল দিই। মাটিটা নরম থাকায় কর্ষণের তেমন দরকার হয় না। তবে একদম করি না বলা যাবে না। মাঝে মাঝে যখন অবহেলায় গাছটা পড়ে যায় অথবা জমিটা শুকিয়ে যায়, তখন একটু হাত লাগাতে হয়। যদি ঠিকমতো খেয়াল রাখা হয় তাহলে টিলিংয়ের (চাষের) কখনই দরকার হয় না।

ওখানে প্রচুর কেঁচো জন্মায়, যারা স্বাভাবিক চাষের কাজটা করে দেয়, মাটিতে বায়োমাস থাকে, ছায়া থাকে। এসবের ফলে মাটি আলগা হতে থাকে। জঙ্গলে আর কে চাষ করতে যায়? এই অংশটায় জমির পরিমাণ এক একরের কিছু কম। নালার ওপারে আর একটা অংশ রয়েছে, সেখানে গুছিয়ে চাষ করা হয়নি।

প্রথমে জমি কিনতে আমাদের কিছু পয়সা লেগেছিল। জমি আমরা তখন সস্তাতেই পেয়েছিলাম। তখন ওখানে বাড়িঘর ছিল না, রাস্তা ছিল না। দু'কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হত। তখন আমরা ৩০,০০০ টাকা করে একর প্রতি দাম দিয়েছিলাম — স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি নিয়ে। পাঁচটা প্লট ছিল, জমির মালিকদের মধ্যে দু'জন ছিল বড়ো, ওদেরই বেশি জমি ছিল। এখন অবশ্য ঝটঝট করে জমির দাম ওখানেও বেড়ে যাচ্ছে। আম্বানির নাম এখন ওখানেও শোনা যাচ্ছে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ৫০০০ একরের সিলিং বেঁধে দিয়েছে, তাই ওরা কয়েক জায়গায় ভাগ ভাগ করে কিনতে চাইছে। আসলে সব জিনিসই তো পাওয়া যায়, কেবল জমিই দুর্লভ, ফ্যাকট্রিতে তো বানানো যাবে না! ওরা চারপাশে দালাল ছড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে যা জমি পাওয়া যায় সস্তায় কিনে নাও, পরে দাম বাড়লে ছাড়া যাবে। আমরা পাশে একটা ১০ একর জমির প্লট কিনতে চেয়েছিলাম। সেটা আর একজন কিনে একবছরের মধ্যে আবার আর একজনকে বিক্রি করে দিল দ্বিগুণ দামে।

আমাদের জায়গাটা দুটো গ্রামের মাঝখানে। নীচের দিকে একটা অবস্থাপন্ন গ্রাম দু' কিলোমিটার দূরে, আমাদের জমির মালিকরাও ওই গ্রামের লোক। ওপরের দিকে দু' কিলোমিটার দূরে একটা আদিবাসী গ্রাম। এখানকার বাসিন্দাদের হাতে জমি কম। এখন ওখান থেকেই কৃষিমজুর সরবরাহ হচ্ছে অন্যত্র। নীচের দিকের গ্রামে যারা লেখাপড়া

শিখেছে, তারা চাষ করতে চাইছে না, জমি ওদের প্রচুর, কিন্তু চাষ করার লোক নেই। আদিবাসীদের জমিতে খাটবার চাহিদা প্রচুর। জমির মালিকরা বলছে, ঠিক আছে, তুমি বারো আনা রাখো, আমায় চার আনা দাও। চাষের খরচ অবশ্য ওখানে তেমন নেই। ওপরের দিকে জঙ্গল থাকায় প্রতি বছর বৃষ্টিতে ভালো মতো মাটি ধুয়ে চলে আসে। আমরা জমি কেনার দু'বছরের মধ্যেই গভর্নমেন্টের সয়েল কনজার্ভেশন ডিপার্টমেন্টের লোকেরা কাজ করে। আমরা সেই কাজটা একটু চালিয়ে গেছি। বাঁধের মতো ব্যবস্থা করে মাটিটাকে আটকে দিয়েছি। আমাদের পুরো সীমানার মধ্যেও কিছু শুকনো আর সবুজ ঝোপ হয়ে গেছে, তাতেও মাটি আটকায়। মাটি-ক্ষয় এতে কমে গেছে ৮০ শতাংশের ওপর।

ভাস্কর সাভের ওখানে ১৪ একরে [কল্পবৃক্ষ-এ] সব নিজেই দেখেন। আমাদের ৬৪ একরে পাঁচজন আদিবাসী মানুষ আছেন, স্বামী-স্ত্রী ছেলে নিয়ে একটা পরিবার আর দু'জন। ওঁদের এখানেই থাকার কথা। কিন্তু কখনও দু'জন, কখনও তিনজন থাকেন, অর্ধেক সময় গ্রামে চলে যান। তবে ওঁরাই লাগাতার দেখাশোনা করেন, মাইনের ব্যবস্থা রয়েছে আর খাবারটা বাগান থেকেই সংগ্রহ হয়ে যায়। ডাল, তেলের মতো কিছু জিনিস কিনতেও হয়। গম ওখানে খুব কম ব্যবহার হয়, আমরা ওখানে রাগি চাষ করি, ওতে খুব ভালো রুটি হয়। এটা খুব পুষ্টিকর আর সুস্বাদু। এদেশে এটা গম চালের চেয়ে সস্তা অথচ এর রপ্তানি-মূল্য বাসমতি চালের থেকে বেশি। বাচ্চা ও অসুস্থ মানুষের পক্ষে এটা পুষ্টিকর আর হজম করাও সহজ। আদিবাসীরা এটা নিজেরাই ফলায়। আশপাশের গ্রামেও আগে হত, কিন্তু এখন তাদের জিবের স্বাদ বদলে গেছে, সব ধান গম চাষের দিকে চলে গেছে। চল্লিশ-পঞ্চাশোর্ধ যারা, তাদের খেতে ভালো লাগে। ছোটোদের হয়ত সেরকম জিবের স্বাদ তৈরি হয়নি। আমাদের গ্রুপটার মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি সময় দিই। মাঝেমাঝে আমরা ক্যাম্প করি। তখন আমরা হয়ত গাছ লাগালাম, জলসেচ করলাম অথবা বাড়ি তৈরির কাজ করলাম। কিন্তু সেটা খুবই সামান্য আর বিচ্ছিন্ন। সেভাবে বললে সামাজিক দিক থেকে আমাদের খুব দুর্বলতা আছে, প্রকৃতি কিন্তু তার কাজ ভালোভাবেই করে যাচ্ছে। ওখানে এখন একটা সমাজ তৈরি হয়ে যেতে পারে, জমিটা এত উর্বর, এত সবুজ গাছপালা। যেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করেছি, নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে যখন মাটি শুকিয়ে যায়, নালার নীচে জঙ্গলের এত ভালো মাটি এসে জমা হয়, আমরা সেটা নিয়ে আশেপাশে চাষের মধ্যে ছড়িয়ে দিই। তাতে জল সঞ্চয়ের ক্ষমতা বেড়ে যায়, আবার মুফ্‌ত চাষের উর্বরতা বেড়ে গেল। কিচ্ছুর দরকার নেই। একটু অভাব সূর্যের আলোর, কারণ জঙ্গলটা ঘন হয়ে গেছে। যেখানে নতুন করে কিছু লাগাতে চাই, সেখানে একটু কেটেছেঁটে নিতে হয়, নাহলে সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। গাছ খুব ধীরে বাড়ে, কিন্তু মরে যায় না। যেখানে হয়ত চার বছরের মধ্যে ফল দেওয়ার কথা, আমাদের আট-দশ বছর লেগে যায়।

আমরা যাদের নিয়ে কাজ করছি, তাদের একটা পরিবার, আমাদের থেকেও তারা সক্রিয়, একটা দায়বোধও ওদের তৈরি হয়েছে। আমাদের গ্রুপের লোকেদের একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, তার থেকে এই পরিবারের লোকেদের ধারণাগত বোধ অনেক ভালো। ওরা অবশ্য বুঝে নেওয়ার সুযোগও পেয়েছে। ভাস্কর সাভের ফার্মে ওরা দু'বার গেছে, ভাস্কর সাভেও দু'বার এখানে এসেছেন। এই পরিবেশে থেকে ওরা এই জৈব চাষের পদ্ধতিকে গ্রহণও করে নিয়েছে। গত দু'বছর ধরে দেখছি, চাষিসমাজের মানুষ, যারা আমাদের ওখানে দেখতে আসছে, তারা উৎসাহিত হচ্ছে। এরা দেখতে পাচ্ছে, আমাদের উৎপাদনের হার খুবই ভালো, আমরা রাসায়নিক ব্যবহার করি না। ডিপ বোরিং আমরা করি না, হেভি মোটরাইজড পাম্প আমরা ব্যবহার করি না, অনেক সস্তায় আমরা চাষ করছি। আমাদের সারা বছর যে খরচ হয়, তার ৮০-৯০% যারা কাজ করে তাদের পারিশ্রমিক দিতে খরচ হয়। একদম সাধারণ আদিবাসীদের বাড়ির মতো ঘরে ওরা থাকে। জঙ্গলটা তো দারুণ হয়েছে। এতে ওরা খুব অবাক হয়নি। কিন্তু দুটো সেচযুক্ত জমিতে প্রচুর ফল — কলা, পেঁপে — হচ্ছে। এতে ওরা উৎসাহ পেয়েছে। ওরা চারা নিয়ে গিয়ে নিজেরাই বুনছে।

আমি গত ছ'সাত বছর থেকে দেখছি, প্রত্যেক বছর বৃষ্টি নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। যখন বৃষ্টির দরকার তখন হচ্ছে না। যখন দরকার নেই, তখন বৃষ্টি আর থামছে না। যখন চাষ দেওয়া দরকার, তখন জমিতে জল দাঁড়িয়ে গাছ পচে যাচ্ছে। যখন জল দরকার, তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, চারাগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা মনে হয় যাবে না। কারণ সারা পৃথিবীতেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বর্ষার দিনের সংখ্যা কমছে। খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে আর নয়ত হচ্ছেই না, আগে থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে না। গ্রহ-নক্ষত্রের পুরনো হিসেবটাও মিলছে না। এই মিশ্র-চাষের ব্যাপারটা আগে-পরে সকলকেই ভাবতে হবে। খুব নীচু জমিতে, যেখানে ধান ছাড়া কিছু চাষের কথা ভাবা যায় না, জল সেখানে জমে থাকে। কিন্তু অন্য জায়গায় জলের জন্য পুকুর কেটে নেওয়া যায়। সেই মাটিটা অন্য মিশ্র-চাষের জমিতে দিয়ে একটু উঁচু করে নেওয়া যায়। এরকম না করতে পারলে সমস্যা আসতেই পারে।

প্রথম ন'বছর এপ্রিল-মে মাসে আমাদের জলের অভাব হত। শেষ তিন বছর এটা হয়নি। লাগানো গাছও একবছর মরে যায়। এখন কিন্তু যা পরিস্থিতি, তাতে সুযোগের আমাদের কোন অভাব নেই, অভাব শুধু প্রয়োগের। তাও যতটা করেছি খুবই সফল। ওখানে সবসময় থাকা দরকার। থাকলেই ফলন হবে, না থাকলে গরু চলে আসবে, কেউ এসে ক্ষতি করবে। তবে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই চাষের আগ্রহ রয়েছে।

এখানে যে আদিবাসী সমাজ, এরা চাষিসমাজ, এদের ঠাকুর বলে। আট-দশ বছর আগে, নীচের দিকের তিনটা গ্রামে গ্রীষ্মে জলের সঙ্কট হত। এখন তারা আমাদের জলসেচের জন্য বেঁচে গেছে। আমাদের ফার্মে এখন জঙ্গলও খুব ঘন, হাজার হাজার গাছ খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে রয়েছে। অত ঘন হওয়ার ফলে গাছগুলো খুব উঁচু হয়, কিন্তু কাণ্ডটা সেরকম মোটা হয় না। নতুন মাটি প্রচুর তৈরি হচ্ছে, জৈববৈচিত্র্য প্রচুর, খুবই মূল্যবান সব গাছ রয়েছে। একবার আমরা স্থানীয়দের মধ্যে যারা জানে, ওপরের আর নীচের গ্রামের, তাদের নিয়ে একটা সমীক্ষা করেছিলাম। ১১০ রকম দরকারি গাছ পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে ৩০-এর বেশি ওষধি-গাছ, ৩০টা এমন গাছ আছে যা থেকে বছরের কোন না কোন সময়ে কিছু খাবার পাওয়া যায়, ২০ ধরনের কাঠের তক্তার গাছ আছে, তারপর রয়েছে নানারকম মূল্যবান গাছ, যেমন খয়ের, টিক ইত্যাদি।

অনুলিখন : জিতেন নন্দী

বিকল্পের ভেনেজুয়েলা

শমীক সরকার

'ভেনেজুয়েলা'র উৎপত্তি

এখানকার মানুষ নিজেদের অঞ্চলকে কী বলত কে জানে, তবে পশ্চিমি দুনিয়া এটাই বিশ্বাস করে, ভূখণ্ডটির নাম ভেনেজুয়েলা দিয়েছিলেন আমেরিগো ভেসপুচি। ১৪৯৯ সালে নৌবহর নিয়ে এখানে এসে জলাশয়ের ওপর এখানকার অধিবাসীদের তৈরি ছোটো ছোটো ভাসমান গ্রাম (প্যালাফিটো) দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় ইতালির ভেনিসের (ইতালিয়ান ভাষায় ভেনেজিয়ার) কথা। তারই ছোটো সংস্করণ ভেনেজুয়েলা বা ছোট্ট ভেনিস। ১৪৯৮-তে এখানে এসেছিলেন কলম্বাস। পেরুর ইনকা বা মেক্সিকোর আজটেক ও মায়া সভ্যতার মতো অতখানি উন্নত হয়ে ওঠেনি এখানকার 'ইন্ডিয়ান' জনজীবন। ঐতিহাসিকরা বলেন, এখানে মানুষের সভ্যতা ১৫০০০ বছরের পুরনো। কৃষি এবং শিকারের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় এখানে। আমেরিগো ভেসপুচির ভেনেজুয়েলা আবিষ্কারের পরপরই স্প্যানিশ আগ্রাসন শুরু হয় এখানে, ১৫২২ সালে। আদি বাসিন্দাদের প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, প্রতিরোধীদের খতম করে, কখনও বা গোষ্ঠীগুলিকে চূর্ণ করে কায়েম হয় ইউরোপীয় শাসন। স্প্যানিশ আগ্রাসনের আগে অবধি মানুষ এখানে থাকত মূলত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে, গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে। পরিচয়, মালিকানা প্রভৃতিতে গ্রামগত বা পাড়াগত (পড়শি বা নেইবারহুড) ব্যাপারটা ছিল।

দাসপ্রথা

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সোনার খনি আবিষ্কার হবার পরে ভেনেজুয়েলায় স্পেনীয়দের হাত ধরে দাস ব্যবস্থা শুরু হয়। প্রথমে আদি বাসিন্দাদের এবং পরে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা দাসেদের নিয়ে। ইউরোপীয়রা তাদের আনা ঘোড়াগুলিকে বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে চরানোর মাধ্যমে এখানে আরেকটি ব্যবস্থার পত্তন করে। বিশাল বিশাল তৃণভূমির অধিকারী দখলদার স্পেনীয় বা অন্য ইউরোপীয়রা, আর সেখানে ঘোড়া চরাত আদি বাসিন্দারা। সময়ের সাথে সাথে দাস অবস্থান থেকে আদিবাসিন্দারা মুক্তি পায় বটে, কিন্তু নিগ্রোদের জন্য তা রয়ে যায়, গোটা লাতিন আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ জুড়েই। গ্রামভিত্তিক মালিকানা ভেঙে দিয়ে ব্যক্তি মালিকানায় চাষজমিকে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও শুরু করে এই ঔপনিবেশিকেরা। স্পেনীয়রা ভেনেজুয়েলা দখল করেছিল বটে, কিন্তু শাসন করার তুলনায় এখানকার সোনা রূপার খনিগুলির ওপরেই তাদের মন ছিল বেশি। অষ্টাদশ শতকে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে আর একটি ব্যবস্থার পত্তন করে তারা, কোকা চাষ। এই চাষে প্রচুর আফ্রিকান দাস ব্যবহার হতে থাকে। এভাবে স্পেনীয় শাসনকালেই সাদা ইউরোপীয়, কালো আফ্রিকান, এবং বাদামী আদি বাসিন্দা — এই তিনে মিলে গড়ে তুলতে থাকে ভেনেজুয়েলার জনসংখ্যা। যদিও তা সেই সময় ছিল দশ লাখেরও কম।

স্বাধীনতা

নেপোলিয়ানীয় যুদ্ধে স্পেনের শক্তিক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে এখানে স্বাধীনতার আওয়াজ জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। আন্তঃইউরোপীয় যুদ্ধে এখানকার যে সব আদি বাসিন্দা সেনা বা সেনানায়ক হিসেবে অংশ নিয়েছিল, তারা নেতৃত্ব দিতে থাকে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের। স্বাধীনতার লড়াই নতুন দিশা পায় ফরাসী বিপ্লবের হাত ধরে। ১৮১১ সালে ফরাসী বিপ্লব ফেরত একজন ভেনেজুয়েলান সেনানীর নেতৃত্বে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা হয়। যদিও তা হেরে যায় অচিরেই। আবার স্বাধীন ভেনেজুয়েলার ঘোষণা হয় ১৮১৩ সালে, তা টিকেছিল মাস সাতেক। অবশেষে আর একজন ফরাসি বিপ্লব ফেরত, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, 'মুক্তিনায়ক' সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে ১৮২৩ সালে সার্বভৌমত্ব আসে। সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে আরও বেশ কিছু লাতিন আমেরিকান দেশ সে সময়েই স্প্যানিশ আগ্রাসনের হাত থেকেস্বাধীনতা পায়। এ'সব ক'টিকে নিয়ে বলিভার তৈরি করেন 'গ্রান কলম্বিয়া'। এইভাবে গোটা লাতিন আমেরিকাকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করার যে বলিভারিয়ান স্বপ্ন, তা বিংশ শতকেও বহু যুবককে আলোড়িত করেছে ওই মহাদেশে। এক ভেনেজুয়েলাতেই সেই স্বপ্ন নিয়ে তৈরি হয়েছে বহু বিপ্লবী সংগঠন। সাভেজের মতাদর্শও ছাত্রাবস্থা থেকেই এই বামপন্থী, দেশপ্রেমিক 'বলিভারিয়ানিজমো' ঘরানার।

রাষ্ট্রহীনতা, অর্থনীতিহীনতা

১৮৩০ সালে ভেনেজুয়েলা এই গ্রান কলম্বিয়ার মধ্যে থাকতে অস্বীকার করে, তৈরি হয় নতুন রিপাবলিক অব ভেনেজুয়েলা। এরপর প্রায় ১৩০ বছর কাটে সামরিক এবং একনায়কতন্ত্রী শাসনে, তার মধ্যে প্রথম ৭০ বছর শাসনের অনিশ্চয়তায়। আন্দিজ পর্বত, ল্লানোস তৃণভূমি এবং সমভূমির যোগফলে এই ভূখণ্ড শাসন করা ভৌগোলিক কারণেই বেশ মুশকিল। প্রতিটি মনুষ্য বসবাসযুক্ত সমভূমি এলাকার পাশে আছে সমুদ্র, আর অন্যপাশে পর্বত অথবা তৃণভূমির বেড়। তাই প্রত্যেকেই আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন। স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মানে দাঁড়ায় সাদা কোন যুদ্ধবাজ তৃণভূমি-মালিকের অধীনে শ'খানেক আদি বাসিন্দার 'বিপ্লবী' 'ফৌজ' নিয়ে কোন এক অঞ্চল থেকে রাজধানী কারাকাসের দিকে যাত্রা। এই যুদ্ধবাজদের বলা হত কডেলো। কোন কডেলো যে আদি বাসিন্দা বা পার্দোস হত না একদম তা নয়। তবে আদি বাসিন্দা পার্দোস এবং কালো দাসরা ছিল মূলত সেনার দলে। অধিপতি সাদা। যে কডেলোর প্রভাব অন্যান্য কডেলোদের ওপর যত বেশি, তার প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনাও তত বেশি। ১৮৩০ থেকে ১৮৯৯, এই ৭০ বছরে নয় নয় করে প্রায় ৪১ জন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ভেনেজুয়েলার, স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী। তবে কডেলোদের এই অভ্যুত্থান প্রকল্পে রক্তপাত খুব কমই হত। দেখে যেন মনে হয়, কডেলোদের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল, উৎপাটিত হলে বা বিপ্লব করতে গিয়ে পরাস্ত হলে হয় অল্প কয়েকদিনের কারাবাস বা দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই অভ্যুত্থানকারীদের ক্ষমা করে দেওয়ার ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৯২ সালের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক হুগো সাভেজকে আত্মসমর্পনের পর অল্প কয়েকদিন জেলে রেখে ১৯৯৪-তেই ছেড়ে দেওয়াতে। যদিও পার্দোসদের বা দাসেদের বেলায় ব্যাপারটা এরকম ছিল না। গোটা ভেনেজুয়েলায় তখনও বড়ো রাস্তা ছিল মাত্র গোটা কয়েক, আর ছিল পার্দোসদের এবং পশুদের পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া পথ। গোটা উনবিংশ শতক জুড়েই

ভেনেজুয়েলার সমাজে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে স্থানীয় জনজীবনের বড়ো একটা সম্বন্ধ ছিল না। এই সময় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে রপ্তানি-নির্ভর (পশু, কফি) পূর্বদিকের তৃণভূমি অঞ্চলের একটা সখ্যতা লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ শাসকরাই ছিলেন সেই অঞ্চলের। এই রপ্তানি-অর্থনীতির জন্যই ভেনেজুয়েলার বন্দর অঞ্চলগুলিও ছিল কেন্দ্রীয় ক্ষমতার খুব উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। মানুষের বসতিও হয়েছিল এই বন্দরগুলিকে ঘিরে।

ঊনবিংশ শতকে পশু এবং দুধ রপ্তানি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা ছিল। এই সব ব্যবসার মালিকরা ছিল সাদা বা বিদেশি। শোনা যায় একসময় গোটা ভেনেজুয়েলার এক-তৃতীয়াংশ তৃণভূমির মালিক ছিল এক ব্রিটিশ কোম্পানি, যাকে স্থানীয়রা ল্যাকেস্টার বলে ডাকত। এরা ব্রিটেনে প্রচুর বিফ সরবরাহ করত। এই ব্যবসা করা খুব সহজ ছিল। কেবল বর্ষার সময়টা পশুদের খাওয়াতে হত কিনে। বাকি সময়টা তৃণভূমি এদের খাবার সরবরাহ করত।

ঊনবিংশ শতকের শেষ অবধি গায়ানা এবং আন্দিজের মানুষেরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কামড়াকামড়িতে খুব একটা অংশ নেয়নি। গায়ানায় মানুষ খুব কম ছিল। কিন্তু আন্দিজের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। কফি চাষের জন্য খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠছিল এই এলাকা এবং রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতির কারণে তা সমৃদ্ধও হয়ে উঠছিল। বাড়ছিল জনঘনত্ব। তৃণভূমি অঞ্চলের ম্যালেরিয়া বা পীতজ্বরের প্রকোপ এখানে কম ছিল। সব মিলিয়ে আন্দিজ ভেনেজুয়েলার ১৫ লক্ষের মতো মানুষের প্রায় অর্ধেকের বাসভূমি হয়ে দাঁড়ায়। বিংশ শতকের শুরু থেকে এই অঞ্চল কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে এবং ক্ষমতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে। আন্দিয়ান সামরিক বাহিনী নিয়ে সিপিরিয়ানো কাস্ত্রো ভেনেজুয়েলা শাসন করতে শুরু করেন। এসময় ইউরোপের কাছে পূর্ববর্তী শাসকদের নেওয়া ঋণ তার দাম চাইতে শুরু করে।

সিপিরিয়ান কাস্ত্রোর পরে প্রেসিডেন্ট হন তাঁরই সহযোগী গোমেজ। তিনি এসেই ভেনেজুয়েলার আন্তর্জাতিক ঋণ বাতিলের চেষ্টা করেন, মজবুত সেনাবাহিনী তৈরি করেন আন্দিয়ান সামরিক বাহিনী নিয়ে। ততদিনে যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতির ফলে সামরিক অভ্যুত্থানে খানিকটা ভাঁটা পড়ে।

তেল আবিষ্কার

ভেনেজুয়েলা যে তেলের আকর তা বোঝা যেত বহুদিন আগে থেকেই। ছোটো ছোটো কূপ থেকে তেল উঠত। কিন্তু তাকে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে খনিজ তেলের আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি হওয়ায় ইউরোপ বা আমেরিকা থেকে প্রচুর ব্যবসায়ী এসে এই তেল উত্তোলনের বরাত পাওয়ার চেষ্টা করে। এই তেলের বরাতের বিনিময়ে ভেনেজুয়েলার মানুষের একটা অংশ, যাদের জমির ওপর খনি খনন করতে হয়েছিল, প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করে। ১৯১৮ সালে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন শুরু হয় এবং পুরোটাই রপ্তানির জন্য। ১৯২৯ সালের মধ্যে ভেনেজুয়েলা খনিজ তেল রপ্তানিতে এক নম্বর দেশে পরিণত হয়, যদিও সেখানে কোনও তেলের রিফাইনারি তৈরি হয়নি। এই তেল রপ্তানির ওপর কোন প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয়নি, তাই সরকারের প্রত্যক্ষ আয় খুব কম ছিল এই বাণিজ্য থেকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলার সরকারি কর্তাব্যক্তি, বড়ো বড়ো তৃণভূমির মালিক এবং তেলের কোম্পানিগুলির মধ্যে একটা আঁতাতের মধ্যে দিয়ে এই রপ্তানি বাণিজ্য চলতে থাকে। ফলে এই বাণিজ্যে ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষের ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। মুষ্টিমেয় একটা অংশের মানুষ প্রভূত বিত্তশালী হয়ে ওঠে। যদিও তখনও ভেনেজুয়েলার ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬০ শতাংশ আদিবাসী, তবুও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সাদাদের প্রভাব ছিল একচ্ছত্র। তৈল বাণিজ্যের লাভের গুড়টুকুও তারাই খেয়েছিল।

তেলের খনির শ্রমিক

১৯২৮ সালে জুলিয়া রাজ্যে তেল উত্তোলনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা প্রথম ধর্মঘট করে। এই রাজ্য ছিল সবচেয়ে ভালো তেলের জোগানদার। এই রাজ্যের গোটা তৈলক্ষেত্র এই স্ট্রাইকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ধর্মঘটের অন্যতম দুই নেতা, রোডোলফো কিনটেরো এবং জেসাস ফারিয়া (তেলের খনির শ্রমিক) কমিউনিস্ট ছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের দুরবস্থাকে স্বীকার করা হলেও এই ধর্মঘটকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও এই ধর্মঘটের ফলে তেল উত্তোলনের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তেল কোম্পানিগুলি সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তেলের বাণিজ্যের একটা ছোট্ট অংশের ভাগ তাদের কপালেও জুটতে থাকে।

রাষ্ট্র, পার্টি, নির্বাচনী গণতন্ত্র

ভেনেজুয়েলায় ঊনবিংশ শতক থেকেই একটা পরোক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্দোসদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। ভোট ছিল শুধু সাদাদের। আঞ্চলিক ভোটের মাধ্যমে আঞ্চলিক অধিপতি নির্বাচন করা হত। সেই নির্বাচিতরা কারাকাসের অধিপতিকে নির্বাচন করত বা কারাকাসের পার্লামেন্টে মিলিত হত। যদিও এই ব্যবস্থাটি নিজেই ছিল খুব দুর্বল এবং বেশিরভাগ সময়েই কডেলোরা এই কাঠামোটাকে পাত্তা দিত না। ১৯৪৫ সালে একবার ভেনেজুয়েলায় সাধারণ নির্বাচন করার চেষ্টা করা হয় এবং তার কয়েক বছর আগে থেকে পার্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। সম্পূর্ণভাবে পার্দোসদের নিয়ে একটি পার্টি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তার নাম 'গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ' বা অ্যাডেকো (AD)। ধরনের দিক থেকে তা ছিল বামঘেঁষা, সমাজগণতন্ত্রী। এই দলের নেতৃত্বে একটি গণবিক্ষোভ হয় ভেনেজুয়েলায় ১৯৪৫-এ, সাথে যোগ দিয়েছিল মিলিটারিরা। এই গণবিক্ষোভের ফলে অ্যাডেকোর নেতৃত্বে একটি সরকার গঠন হয়। এই গণবিক্ষোভের পটভূমিতেই সংসদের সাধারণ নির্বাচনের পথ পরিষ্কার হয়। তাতে অ্যাডেকোরা জয়ী হয়। আর একটি পার্টি এসময়ে কিছুটা জনসমর্থন পেতে শুরু করে, রাফায়েল ক্যালডেরার নেতৃত্বে 'কোপেই' (ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি)। অ্যাডেকো সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেল কোম্পানিগুলিকে উৎপাদনের ৫০-৫০ অংশ সরকারকে দিতে বলা। ক্যাথলিক স্কুল বন্ধ করে দিয়ে জাতীয় পাঠক্রম চালু করার চেষ্টা, কৃষিক্ষেত্রেও কিছু সংস্কারধর্মী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তার সাথেই বাড়তে থাকে আমলাতন্ত্র এবং তার প্রভাব। ১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্সির জন্য একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অ্যাডেকোরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু ভেনেজুয়েলার ওপরের সারির লোকেরা ক্যালডেরাকে সমর্থন করে।

সামরিকতন্ত্র

১৯৪৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আবার সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তখন কিন্তু ১৯৪৭-এ অ্যাডেকোদের বিপুল জয় এই সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কোন জনপ্রতিরোধ তৈরি করতে পারেনি। অ্যাডেকো

নেতাদের নির্বাসনে পাঠানো হয়। বাকি দলগুলি কোনভাবে টিকে থাকে। এই সামরিকতন্ত্রে বিভিন্ন হাতবদলের পরে **১৯৫২** সালে একনায়ক হন পেরেজ জিমেনেজ। এই পেরেজের সময়ে ভেনেজুয়েলার জনসংখ্যা ছিল **৫০** লক্ষ। এসময় তেলের আকর্ষণে প্রচুর সাদা মানুষ স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি প্রভৃতি দেশ থেকে আসতে শুরু করে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে। পেরেজ নিজে 'সাদা মানুষেরা উত্তম' এই ধারণা পোষণ করতেন। সাদা মানুষদের আগমনের ফলে তাদের এবং পার্দোসদের মিশিয়ে মিশ্র জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। সরকারের তরফে এতে উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে বিভিন্নভাবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে ভেনেজুয়েলার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। এই সময়ে গোটা লাতিন আমেরিকার পটভূমিতে এই সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পায়। গোটা লাতিন আমেরিকায় মার্কিন আধিপত্যের দোসর হিসেবে ভেনেজুয়েলা কাজ করতে থাকে।

পেরেজের একাধিপত্য ও একনায়কত্ব অনেকদিন ধরে সামরিক, প্রশাসনিক স্তরে এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করছিল। **১৯৫৮**–র জানুয়ারিতে জনগণ রাস্তায় নামে। এক দেশপ্রেমিক চক্র (Patriotic Junta)–র সামরিক বিদ্রোহের সামনে পেরেজ পালিয়ে যান। যদিও এই সামরিক বিদ্রোহ কোন পাল্টা ক্ষমতা তৈরি করতে পারেনি। রাজধানী কারাকাসে অরাজকতা তৈরি হয়। **১৯৫৮** সালে সামরিক ব্যক্তিত্ব এবং কারাকাসের মানুষের নেতা হিসেবে লারাজাবেল বলে একজন প্রেসিডেন্ট হন। তিনি এসে একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা নেন, জরুরি পরিকল্পনা নাম দিয়ে। এই পরিকল্পনায় বলা হয়, কারাকাসের কোন মানুষ যদি নিজেকে বেকার বলে দেখাতে পারে, তাহলে তাকে বেকার ভাতা দেওয়া হবে। এই বেকার ভাতার পরিমাণ ছিল ভেনেজুয়েলার গ্রামীণ জনগণের যা আয়, তার থেকে বেশি। ফলে প্রচুর মানুষ, পার্দোসরা, গ্রাম থেকে কারাকাসে চলে আসে। কারাকাসের জনসংখ্যা নিমেষে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

প্রতিনিধিত্বমূলক/পশ্চিমি গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

ওই বছরই সাধারণ নির্বাচন হয় ভেনেজুয়েলায়। আর্মির সাথে পার্টিগুলির একটি চুক্তির ভিত্তিতে ঠিক হয় যে মিলিটারি 'স্বাধীন তার নিজের এলাকায় এবং তার বিনিময়ে তারা নির্বাচনী ফলাফলে হস্তক্ষেপ করবে না'। কমিউনিস্টদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। **১৯৫৮** সালের সাধারণ নির্বাচনে অ্যাডেকোরা প্রথম, লারাজাবেল দ্বিতীয় এবং ক্যালডেরা তৃতীয় হয়। সরকার গঠিত হয়েই একটা সিদ্ধান্ত নেয়, ভেনেজুয়েলার সবচেয়ে বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিভি, অটোনোমাস স্বীকৃতি পায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন রাজনৈতিক চর্চার কর্মশালা ছিল অনেকদিন ধরেই। এই সিদ্ধান্তের পরে সেখানে পুলিশ ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তা প্রচুর বামপন্থী, কমিউনিস্ট প্রভৃতি বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল এবং কাজের জায়গা হয়ে ওঠে। অ্যাডেকো সরকার মার্কিন সরকারের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখে, এমনকি তা সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি, একনায়কতন্ত্রী বলে। এই সরকার সারা ভেনেজুয়েলা জুড়ে রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেয়। ভেনেজুয়েলায় তেলের খনিগুলির সংলগ্ন অঞ্চল প্রধানত খনি মালিকদের মুক্তাঞ্চল ছিল। তারা সেখানে তাদের সুবিধামত রাস্তা প্রভৃতি তৈরি করে নিয়েছিল। জাতীয় সড়কগুলি এবার তাদের যুক্ত করতে থাকে। এই সময়ে পেরেজের নেওয়া রেললাইনের উদ্যোগও বাস্তবায়িত হয়। কিছু ছোটো ছোটো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়। ভেনেজুয়েলার বিদ্যুতের চাহিদার **৭৫%** পূরণ করে এই জলবিদ্যুৎ, এখনও। পেরেজের সময়ে ভেনেজুয়েলার তৃণভূমিতে ধান চাষ করে একে চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অ্যাডেকো সরকার সেই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে দেয়নি। এই সরকার বিদেশি কোম্পানিগুলিকে এদেশে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট শুরু করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকে, যা ছিল তার আমদানি অর্থনীতিকে বদলানোর পরিকল্পনার অঙ্গ। এরই ফলাফল ভেনেজুয়েলার অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি, আদতে কিছু অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট। ফলে এগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। কিন্তু গাড়ি কোম্পানিগুলি এদেশে গাড়ি অ্যাসেম্বলি করতে চাইত, কারণ তা তারা বিনা রাজস্বে করতে পারত। এসময় অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়। আদতে তা বিদেশি বড়ো পুঁজির স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ফলে একদিকে আমলাতন্ত্র বড়ো হতে থাকে, অন্যদিকে বিদেশি পুঁজি নির্বিঘ্নে তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এসময়ে পশুপালনের দিক থেকেও স্বনির্ভরতা আনার চেষ্টা হয়, যদিও তা হয় বিদেশি পুঁজির প্রত্যক্ষ সাহায্যে। দুধ উৎপাদন ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

মার্কিন ছোঁয়া

অ্যাডেকো সরকারের এই অর্থনৈতিক উদ্যোগের পরিকল্পনার পেছনে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তা প্রত্যক্ষভাবে। জন এফ কেনেডির নেতৃত্বে তখন মার্কিন প্রশাসন যে "উন্নতির আঁতাত" তৈরি করেছিল, তাতে লাতিন আমেরিকার উদাহরণ হিসেবে ছিল ভেনেজুয়েলা। কথা ছিল, উন্নয়ন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে সাধারণ মানুষের ওপর। কিন্তু যাবতীয় অর্জন খেয়ে নিচ্ছিল সরকার এবং পার্টি ঘনিষ্ঠরা। যাই হোক এসময়ে কিছু বৃত্তিমূলক স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। এই সময় ফিদেল কাস্ত্রোর সফল বামপন্থী অভ্যুত্থানে উৎসাহিত হয়ে ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্টরা কিছু সশস্ত্র কার্যকলাপ নেয় শহরে। যদিও তাদের বড়ো একটা জনভিত্তি ছিল না।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভোগের আয়োজন

১৯৬৩ সালের নির্বাচনেও অ্যাডেকো জয়ী হয়। **১৯৬৮**–র নির্বাচনে অ্যাডেকোরা হেরে যায় ক্যালডেরার কাছে, মাত্র **৩০** হাজার ভোটে। **১৯৭৩**–এ অ্যাডেকোরা আবার জিতে যায়। কার্লোস পেরেজ প্রেসিডেন্ট হন এবং সংসদ থেকে **২০০** দিনের ডিক্রি জারি করে শাসন চালানোর সম্মতি আদায় করে নেন। কার্লোস পেরেজ সরকারি খরচ বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। বহু মানুষ সরকারি চাকরি পায়। সরকারি খরচের ওপর সংসদের নজরদারি চলে যায়। সরকারি খরচ বাড়ার সাথে সাথেই শুরু হয় ব্যাপক দুর্নীতি। কারাকাসের এলিটদের মধ্যে ভোগবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মিয়ামি বিচে গিয়ে বাজার করা একটা রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তেল একটি ফাঁপা অর্থনীতি তৈরি করে, আদ্যন্ত ভোগ এবং অপচয় নির্ভর, যা আদতে মার্কিন পুঁজিকে পুষ্ট করে চলে, কাঁচামাল এবং পণ্যের বাজার সরবরাহ করার মাধ্যমে। বামপন্থী গেরিলাদের হাত ধরে আসা বন্দুকেরও ব্যাপক বাজার তৈরি হয়। পেরেজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে ধার করে দেশের শিল্পগুলি সরকারের মাধ্যমে চালানোর বন্দোবস্ত করেন। **১৯৭৫** সালে লোহা শিল্প রাষ্ট্রায়ত্বকরণ হয়, এমনকি তেল বাণিজ্যকেও **১৯৭৬** সালে রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। লাইসেন্সরাজ চালু হয়, যা ভেদ করা বিদেশি বড়ো পুঁজির পক্ষে সহজ ছিল, স্থানীয় ছোটো পুঁজিপতিদের কাছে তা ছিল অসম্ভব। তেল কোম্পানি এবং অন্যান্য জায়গার সংগঠিত শ্রমিক, যারা ছিল সুবিধাভোগী, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং

অ্যাডেকোদের ইউনিয়নের সদস্য, তারা সম্পূর্ণভাবে কার্লোস পেরেজের পক্ষে দাঁড়ায়। গ্রাম ভেনেজুয়েলার কোন পরিবর্তন হয় না। শহরে প্রাচুর্য্য মাত্রাছাড়া রূপ ধারণ করে। এমনকি সরকার ভর্তুকি দিয়ে আমদানি করা গাড়ি বাজারে ছাড়তে থাকে। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে অ্যাডেকোরা হেরে যায়।

সংকট

১৯৮০-র দশকের গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম পড়তে শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক ঋণের চাপে ভেনেজুয়েলার ফাঁপা অর্থনীতি ফাঁসতে শুরু করে। জাতীয় মুদ্রা বলিভারের দাম অর্ধেক হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৮৩ সালের নির্বাচন হয়। অ্যাডেকো আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। ফাঁপা অর্থনীতির ফেঁসে যাওয়া চালু থাকে। ১৯৮৮ সালে নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে এই অর্থনীতি প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়ে। অ্যাডেকোরা কার্লোস পেরেজকে মনোনয়ন দেয়। পেরেজের প্রথম রাষ্ট্রপতিত্বের বছরগুলির সোনার সময়ের কথা মানুষের মনে ছিল। পেরেজ জিতে যান।

নয়া-উদারনীতি

নির্বাচনের আগের প্রচারে এবং শপথ গ্রহণের দিনের বক্তব্যে পেরেজ আইএমএফ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক অর্থ-সংস্থাগুলিকে তুলোধোনা করেন। ঠিক তার পনেরো দিনের মাথায়, তিনি সম্পূর্ণ ঘুরে যান। পেরেজের নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলায় শুরু হয় নয়া-উদারনীতির যাত্রা[১] বিভিন্ন বিজনেস ও ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের মানুষজনকে নিয়ে পেরেজ নতুন একটি টীম তৈরি করেন। অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণ ও প্রণয়নের ভার পড়ে তাদের ওপর। এমনকী নিজের দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে মন্ত্রীত্ব থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু তাদের ওপর সঁপে দেওয়া হয়। আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আন্ত আমেরিকা ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে সংস্কারসাধন, যার নাম দেওয়া হয় 'প্যাকেজ'। বাণিজ্যের আগল হাট করে খুলে দেওয়া হয়। বৈদেশিক মাল আমদানি রপ্তানিতে প্রায় করমুক্তি ঘটে। ভর্তুকি কমিয়ে দেওয়া হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা শিথিল করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির প্রশাসনে অনেকটা স্বশাসন দেওয়া হয়, রাজনৈতিক দলের অধিকার খর্ব করা হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা আঞ্চলিক প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। শুরু হয় আমূল বেসরকারিকরণ। এর ফলশ্রুতিতে ভেনেজুয়েলায় তেলের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়। একরাতে সরকারি যানবাহনের ভাড়া বেড়ে যায় ৩০ শতাংশ। বেসরকারি যানবাহনের ভাড়া হয় দ্বিগুণ।

কারাকাজো

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, কারাকাসের মানুষ জনবিদ্রোহে ফেটে পড়ে। ১৯৫৮-র বিদ্রোহের ঠিক তিরিশ বছর পর পেরেজের বিভিন্ন নয়া-উদারনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে আবার মানুষ রাস্তায় নামল। ১৬ ফেব্রুয়ারি এসেছিল পেরেজের 'প্যাকেজ', ২৬ ফেব্রুয়ারি পেট্রলের দাম বাড়ল ১০০%। বিক্ষোভ শুরু হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায়। অসংগঠিত শ্রমিকেরা ভোরে তাদের কাজের জায়গায় আসার পথে গাড়িতে উঠে জানতে পারে, ভাড়া বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভ, যান পোড়ানো, লুঠতরাজ। গ্যারেনাস শহরে প্রথম বিক্ষোভ শুরু হবার পরে অচিরেই তা ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী কারাকাসে। ছাত্ররা রেল স্টেশন দখল করে নেয়। রাগ গিয়ে পড়ে মূলত যান চালকদের ওপর। সেদিন বিকেলের মধ্যে গোটা কারাকাসের সমস্ত জেলায় শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভ, বড়ো বড়ো দোকানে লুঠ। রাজধানী কারাকাস পেরিয়ে এই বিদ্রোহ সান ক্রিস্টোবাল, বারকিসিমেতো, মারকে, বার্সেলোনা, পুয়ের্তো লা ক্রুজ, মেরিডা, মারাকাইবো, ভ্যালেন্সিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে ওই একদিনেই। আন্তর্জাতিক এবং ভেনেজুয়েলার বড়ো মিডিয়া এই বিক্ষোভকে দাঙ্গা নাম দেয়। পেরেজ জরুরি অবস্থা জারি করে মিলিটারি নামিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। ২৭ তারিখ দুপুরবেলা থেকেই গুলি চালানো শুরু হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি অত্যাচার চালানো হয় কারাকাস সংলগ্ন গরিবদের পাড়া সেরোস-এ। সরকারি হিসেবে ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে ২৭৬ জন মানুষ নিহত হয়, হাজার হাজার মানুষ আহত এবং প্রচুর মানুষ নিখোঁজ হয়। যদিও এ হিসেব হিমশৈলের চূড়া মাত্র, পরে আবিষ্কৃত হওয়া গণ-কবর থেকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। কারাকাসের এই গণবিদ্রোহ এবং তার দমন 'এল কারাকাজো' নামে বিখ্যাত। এই ধরনের স্বতস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ চলতে থাকে, পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে পুয়ের্তো লা ক্রুজ এবং বার্সিলোনাতে ও জুনে মারাকাইবোতে এই ধরনের বিদ্রোহ দমনে সেনা নামাতে হয় আবার।

কারাকাজো ছিল সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ। কোনও রাজনৈতিক দল তাতে অংশ নেয়নি। ছিল না কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা দিশা। তবে অনেকের মতে এই গণবিক্ষোভ থেকে শিক্ষা নিয়ে বা তার শক্তিকে কিছুটা ব্যবহার করার আকাঙ্খা থেকেই সাভেজ ১৯৯২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। তাঁর সঙ্গে সেনাবাহিনীর মাত্র ১০ শতাংশের সমর্থন থাকলেও তাঁর মাথায় ছিল, যদি পেরেজকে বন্দী করতে পারেন, তবে কারাকাজোর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তিনি ক্ষমতার বদল ঘটাতে পারবেন।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ — নয়া উদারনৈতিক দশ বছর

উদারনৈতিক সংস্কার প্রবল গতিতে চলতে থাকে। এবং তা ভেনেজুয়েলার পুঁজি অর্থনীতিকে ধ্বস্ত করতে থাকে। জি ডি পি হ্রাস পায়। পুঁজি বিনিয়োগ, কী সরকারি কী বেসরকারি, হ্রাস পেতে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে শ্রমের ভাগ কমে যায়, পুঁজির ভাগ বেড়ে যায় (নীচের টেবিল দ্রষ্টব্য)।

সময়কাল	জাতীয় আয়ে বেতন ও মজুরির ভাগ	জাতীয় আয়ে কর্পোরেট প্রফিট, ডিভিডেন্ড, রেন্ট ও ইন্টারেস্ট পেমেন্টের ভাগ
১৯৫০-৬০	৪৭%	৫৩%
১৯৬০-৭০	৪৬%	৫৪%
১৯৭০-৮০	৪৯%	৫১%
১৯৮০-৮৮	৪৬%	৫৪%
১৯৮৯-৯৮	৩৬%	৬৪%

[১] **১৯৮৯ সালে জন উইলিয়ামসন লাতিন আমেরিকার নয়া-উদারনৈতিক নীতির নির্দেশিকা স্বরূপ 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' নামক দশ দফা কর্মসূচী প্রনয়ণ করেন।**

১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাভেজের নেতৃত্বে সামরিক অফিসারদের একটি সংগঠন 'বলিভারিয়ান বিপ্লবী মুভমেন্ট' (MBR 200) সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করে এবং ব্যর্থ হয়। সহযোগী সামরিক অফিসারদের আত্মসমর্পনের নির্দেশের জন্য এই অভ্যুত্থানের নেতা সাভেজ জাতীয় টিভিতে একটি বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পান। রাজনৈতিক জনমানসে সাভেজের উদ্ভব ওই বক্তৃতা থেকেই। ওই বক্তৃতায় সাভেজ 'তখনকার মতো' পরাজয় স্বীকার করে নেন। তিনি বন্দী হন। পেরেজ পরের বছরেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ক্ষমতাচ্যুত হন। দুর্নীতির দায়ে প্রথমে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর দল রামোন ভেলাসকুয়েজ-কে প্রেসিডেন্ট পদে বসায়। পরে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে জিতে রাফায়েল ক্যালডেরা ক্ষমতায় আসেন। তিনি নির্বাচনের প্রাক্কালে অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করলেও অভ্যুত্থানের সংগত কারণ আছে বলে সংসদে ভাষণ দেন। রেকর্ড সংখ্যক মানুষ, ৪০%, ভোটদানে বিরত থাকে। সাভেজ জেল থেকেই তাঁর সমর্থকদের ভোটদানে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। ক্যালডেরার সময়েও বেসরকারিকরণ চলতে থাকে। ১৯৯৪-তে তিনি সাভেজকে মুক্ত করে দেন, অনেকটা জনমানসের চাপে, ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখেই।

ভেনেজুয়েলার বামপন্থা

১৯৫৮-র জনবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এক বিদ্রোহী র‍্যাডিকাল প্রজন্ম ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। তাতে পুষ্ট হয় বামপন্থা এবং বামপন্থী দলগুলি। একসময় বামপন্থা প্রতিফলিত হত দলের মধ্য দিয়ে, পরবর্তীতে ব্যক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাঙন এবং উপদলের মধ্য দিয়ে দলগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। আমরা এই প্রজন্মের প্রতিনিধি-স্বরূপ কয়েকজনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বাম রাজনীতির ধারাগুলিকে বুঝতে চাইব। এঁরা চালু গণতন্ত্রের পরিসরে বিভিন্ন দলের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। পরে কেউ কেউ গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেন। আবার এঁদের অনেকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীও হয়েছিলেন।

জোসে ভিসেন্তি র‍্যাঙ্গেল (জন্ম ১৯২৯) প্রথমে ১৯৪৬ সালে তৈরি 'গণপ্রজাতন্ত্রী দল' URD (Union Republicana Democratica)-তে যোগ দেন। ১৯৬৪-তে তিনি দল ছাড়েন। পরে 'সমাজতন্ত্রের আন্দোলন' MAS (Movimiento al Socialismo)-এর হয়ে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হন। আর্জেলিয়া লায়া (জন্ম ১৯২৬) প্রথমে অ্যাডেকো (AD)-র সদস্যা ছিলেন। ১৯৭০ সালে যখন MAS তৈরি হল, তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। ১৯৬০-এর দশকে তিনি গেরিলা লড়াইয়ে যোগ দেন। তিয়োদরো পেটকফ্ (জন্ম ১৯৩১) শুরুতে 'কমিউনিস্ট পার্টি' PCV (Partido Communista de Venezuela)-র সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮-তে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করল, তাঁর মোহভঙ্গ হল। তার আগে ১৯৬১ সালে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬২-তে গেরিলা গোষ্ঠী FALN (Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional) বেটানকোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই শুরু করে। পেটকফ্ ডগলাস ব্রাভোর সঙ্গে পাহাড়ে চলে যান। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত কারাবাস করেন সান কার্লোস জেলে, যেখানে ১৯৯২-তে সাভেজকে সাময়িকভাবে রাখা হয়েছিল। ১৯৭০-এ PCV ছেড়ে অন্য কমিউনিস্ট সাথীদের সঙ্গে নিয়ে MAS তৈরি করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি MAS ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। ডগলাস ব্রাভো (জন্ম ১৯৩৩) প্রথমে PCV-র সদস্য ছিলেন। গেরিলা আন্দোলনের সংশ্রব ছাড়তে না চাওয়ায় ১৯৬৭-তে বহিষ্কৃত হন। পরে তিনি ফ্যালকন স্টেটে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক দল PRV (Partido de la Revolucion Venezolano) তৈরি করেন। আমেরিকো মার্টিন (জন্ম ১৯৩৮) প্রথমে AD-র যুব আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯৬০ সালে MIR গঠন করেন। পরে তিনি গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেন।

আমরা যদি বামপন্থার এই ধারাগুলিকে কিছুটা কালানুক্রমে দেখি, কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের আগে পর্যন্ত চল্লিশের দশকে এক ধরনের (বুর্জোয়া) গণতান্ত্রিক ধারা ছিল। ছাত্রসমাজ, কিছু পেশাদার গোষ্ঠী, শ্রমিকশ্রেণী এবং শহুরে স্প্যানিশ পাড়াগুলি থেকে কমিউনিস্ট সদস্যভুক্তি হতে থাকে। ১৯৫৭-তে কমিউনিস্ট পার্টি PCV-র সদস্য ছিল মোট হাজার খানেক, একবছরের মধ্যেই তা ৯০০০-এ পৌঁছায় এবং ১৯৬২-তে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৪০,০০০। কিন্তু এর মধ্য থেকে ষাটের দশকে গেরিলা যুদ্ধের ধারা আত্মপ্রকাশ করে। এই গেরিলা যুদ্ধের ব্যর্থতার পর টিকে থাকা বামকর্মীরা সত্তরের দশকের গোড়ায় 'সমাজতন্ত্রের আন্দোলন' MAS গঠন করে।

হুগো সাভেজ (জন্ম ২৮ জুলাই ১৯৫৪) ১৯৯৮ সালের জুনে রিচার্ড গট-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্মৃতিচারণ করেন, "সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের মূল প্রকল্প ছিল সামাজিক ন্যায়, সমতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব; আমি যখন বারিনাস-এ স্কুলের ছাত্র, তখন ওইসব শ্লোগান শুনতাম।" তারপর সত্তরে যখন MAS তৈরি হল, তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। পরবর্তীকালে বামপন্থার বাস্তব চেহারাও তিনি বর্ণনা করেছেন, "ওইসব গ্রুপগুলিকে দেখে মনে হত, তারা যেন এই গ্রহের কিংবা নিদেনপক্ষে এই ভূখণ্ডের একমাত্র বিপ্লবী হিসেবে নিজেদের জাহির করার পবিত্র কর্তব্য গ্রহণ করেছে। আর যারা এদের বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে অনুসরণ করে না, তাদের সাচ্চা বিপ্লবী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। আমি 'বান্দেরা রাজা' (Red Flag)[১]-এর একজন নেতার সঙ্গেও পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলতে পারিনি।"

১৯৯০-এর দশক ছিল ভেনেজুয়েলার জনগণের হতাশা আর রাজনৈতিক অনীহার দশক। ব্যক্তি হিসেবে সাভেজ এবং অন্য বামপন্থীদের অনুসন্ধান কিন্তু চলছিল। সত্তরের দশকে পেরুর সামরিক বিপ্লবের প্রভাব ছিল তাঁর ওপর। ১৯৮২-র নভেম্বরে তিনি কারাকাস ও বলিভার স্টেটে সক্রিয় 'র‍্যাডিকাল কজ' (La Causa R)-এর প্রতিষ্ঠাতা আলফ্রেডো মানেইরো-র সঙ্গে কথা বলেন। মানেইরো এর পরেই মারা যান। তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওই সাক্ষাৎকারে বলেন, "ভেনেজুয়েলায় গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক ফল হল রাজনৈতিক নেতাদের বিচ্ছিন্নতা, যাঁরা হয়ত দেশে এক ভিন্ন মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ার কাজে হাত লাগিয়েছেন। অনেকে পাহাড়ে রয়ে গেছেন অথবা বিপরীত শিবিরে যোগ দিয়েছেন। আমার মনে হয় এক গোটা প্রজন্মের এই বিচ্ছিন্নতা আর অনুপস্থিতি হয়ত এক নতুন রাজনৈতিক স্রোতের জন্ম দিচ্ছে।

নেতৃত্বের এক বিশাল শূন্যতা রয়েছে — শ্রমিক আন্দোলনে, চাষিদের মধ্যে, বস্তিশহরগুলিতে এবং গোটা সমাজে। এই ঐতিহাসিক

---

[১] **'বান্দেরা রাজা' এখনও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিয়ে চলে এবং নিজেদের ১৯৬০-এর দশকের গেরিলাদের উত্তরসূরী মনে করে।**

পরিস্থিতিতে, কর্মের মাধ্যমে আমাদের যৌথ চেতনার রূপান্তর ঘটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে। এই শূন্যতাকে পূরণ করতে হচ্ছে আমাদের, এক নতুন নেতৃত্বকে জড়ো করতে হচ্ছে।"

সাভেজ সামরিকবিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়াশুনা করেছিলেন। সাইমন বলিভারের আদর্শে তিনি প্রথম সংগঠন তৈরি করেছিলেন ১৯৮২ সালে, MBR 200। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর কর্নেল। নৌ ও বিমানবাহিনীতেও এধরনের বিদ্রোহীদের চক্র ছিল। উইলিয়াম ইজ্যারা নামে এক ট্রটস্কিপন্থী একটা গ্রুপ চালাতেন বিমানবাহিনীতে, আর্মা (Alianza Revolucionaria de Militares Activos)। ইজ্যারাও সাভেজের মতোই পুরনো বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ চালাতেন।

আশির দশকের গোড়াতেই প্রবীণ গেরিলা নেতা ডগলাস ব্রাভোর সঙ্গে সাভেজের আলোচনা শুরু হয়। তাঁরা উভয়েই সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে দেশে একটা তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটা দরকার। কিন্তু ১৯৯১-এর অক্টোবরে তাঁদের একটা মতবিরোধ হয়। ব্রাভো চাইছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের পাশাপাশি অসামরিক জনগণের সাধারণ ধর্মঘটের আকারে অংশগ্রহণ দরকার, যেমনটা ১৯৫৮-তে হয়েছিল। সাভেজ রাজি হলেন না। তারপর ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারিতেই ঘটল দু-দুটো ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান। দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল হার্নান গ্রুবার।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ জেলের মধ্যেই সাভেজ রাজনৈতিক মিত্রদের খুঁজতে শুরু করেন। জেলে সেরকম কড়াকড়ি ছিল না। MAS-এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জর্জ জিয়োর্দানি জেলে সাভেজের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে আর এক প্রবীণ নেতা তিয়োদরো পেটকফ্ স্বাধীন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ক্যালডেরাকে সমর্থন করার জন্য MAS-কে প্রভাবিত করেন। বলিভার স্টেটের জনপ্রিয় র‍্যাডিকাল শ্রমিকদল La Causa R এগিয়ে এল। ক্যালডেরা জয়ী হলেন, পেটকফকে পরিকল্পনা মন্ত্রী করা হল।

প্রেসিডেন্ট সাভেজ

জেলে থাকাকালীন সাভেজ উত্তরাধুনিক মার্ক্সবাদী চিন্তার সাথে পরিচিত হন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ১৯৯৭-তে তিনি 'পঞ্চম রিপাবলিকের আন্দোলন' (MVR) নামে নতুন রাজনৈতিক দল গড়েন। যেহেতু তিনি একটি নতুন সংবিধান প্রস্তুত করতে চান, তাই তাঁর আন্দোলনের এই নাম দেওয়া হয়েছিল, যা এতদিন ধরে চলা চতুর্থ রিপাবলিককে শেষ করতে চায়। ইজ্যারাও MVR-এ যুক্ত হন। এঁদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে দেশপ্রেমিকদের জোট (Patriotic Pole)। ১৯৯৮ সালের ৬ ডিসেম্বর সাভেজ এই জোটের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ভোটে লড়েছিলেন একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে চেয়ে। জিয়োর্দানি উন্নয়নমন্ত্রী এবং প্রবীণ নেতা জোসে ভিসেন্তি র‍্যাঙ্গেল বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

নতুন সংবিধান, নতুন রিপাবলিক

১৮৩০-এ ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার পর ঘন ঘন সংবিধান বদল হয়েছে। ১৯৬১ সালের সংবিধানটিই ১৯৯৯ সাল অবধি চালু ছিল। এটি ২৬তম এবং সবচেয়ে বেশিদিন চলা সংবিধান। ১৯৬১ সালের ভেনেজুয়েলান সংবিধানের মধ্যে দিয়েই সাভেজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেতেন ১৯৯৮ সালের ৬ ডিসেম্বর। এই নির্বাচনে সাভেজের একটা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ নিয়ে গণভোট। ১৯ এপ্রিল সাভেজ গণভোট করান, প্রথমবারের জন্য রাষ্ট্রপতির ডিক্রি জারি করে। গণভোটে দুটি প্রশ্ন ছিল : ১) সাংবিধানিক গণপরিষদ বসবে কিনা ২) এটা রাষ্ট্রপতির দেওয়া কর্মপদ্ধতিতে হবে কিনা। দুটিরই 'হ্যাঁ' জেতে, যথাক্রমে ৯২% ও ৮৬% ভোটে।

সাংবিধানিক পরিষদে কারা কারা থাকবে? এই ভোট হয় ২৫ জুলাই। ১৩১ জন নির্বাচিত হয়। যারা ১৯৯৯-এর বাকি সময়টা জুড়ে নতুন সংবিধানের বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। এই নির্বাচনে সাভেজের MVR এবং কিছু অন্যান্য বামপন্থী পার্টি মিলে তৈরি হওয়া দেশপ্রেমিকদের জোট সাংবিধানিক পরিষদের ১৩১টার মধ্যে ১২০টা সিট জেতে। ১৯৯৯ সালে এই সাংবিধানিক পরিষদ প্রথম 'জরুরি বিচার কমিটি' তৈরি করে। এই কমিটির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় বিচারক অপসারণ করার, সরকারের অন্যান্য অংশের সাথে আলোচনা না করেই। দুর্নীতির দায়ে ১৯০ জনেরও বেশি বিচারককে সাসপেন্ড করে এই কমিটি। ওই মাসেই পরিষদ সাতজনের একটি 'জরুরি আইন কমিটি' তৈরি করে। এর কাজ ছিল জাতীয় সভার আইনি কাজগুলো লাগু করা। ফলে সাভেজের নীতিগুলির আইনসভাগত বিরোধিতা পঙ্গু হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে সাংবিধানিক পরিষদ জাতীয় সভার সব ধরনের মিটিংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এভাবে চতুর্থ রিপাবলিকের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে গিয়ে পঞ্চম রিপাবলিক জায়গা করে নিতে থাকে।

১৯৯৯-এ ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত সাংবিধানিক গণপরিষদ সাভেজের কাঙ্খিত কাঠামোগত পরিবর্তনসহ একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করে। সাভেজের পরিকল্পনা ছিল, ভেনেজুয়েলার সরকারি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে সেদেশের রাজনৈতিক প্রকরণে স্বাধীন এবং তৃতীয় ধরনের শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটানো। এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন গত প্রায় চার দশকের মূল রাজনৈতিক জুড়ি অ্যাডেকো ও কোপেইদের পঙ্গু করে দেয়। [দ্রষ্টব্য সংযোজনী ২]

এই নতুন সংবিধান চলবে কিনা তার ওপর ভোট হয় ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯, এবং 'হ্যাঁ' পায় ৭১.৭৮ শতাংশ ভোট। ২০ ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। ২০০০ সালের মে এবং জুলাই এই নতুন সংবিধানের ওপর দাঁড়িয়ে ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং জাতীয় সভার প্রতিনিধি নির্বাচন হয়। সাভেজের জোট ৬০ শতাংশের ওপর ভোট পায়।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংগঠনের ক্ষমতা

১৯৮৯ সাল থেকেই গোটা ভেনেজুয়েলায় বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পেরেজের হাত ধরে নয়া-উদারনৈতিক সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে, মেয়র নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকারের হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে। ১৯৯৮-এ ক্ষমতায় আসার পরে সাভেজ এই বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া চালু রাখেন কিন্তু এর অভিমুখ বদলান। আঞ্চলিক সরকারের বদলে সাভেজ জনআন্দোলন, জনসংগঠনের হাতে সরাসরি ক্ষমতার কথা বলেন।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের তৃণমূল সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া শুরু হয় ১৯৯৯ সাল থেকেই। প্রথম প্রয়াস বলিভারিয়ান চক্র। বলিভারিয়ান চক্র হল একটু ঢিলেঢালা বাঁধুনির রাজনৈতিক ও

সামাজিক সংগঠন। ১৯৯৯ সালে সাভেজ এগুলিকে শুরু করেছিলেন তৃণমূল গণতন্ত্রের এবং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে। এই চক্রগুলিকে রাখা হয়েছিল বিকেন্দ্রীকৃত হিসেবে, কোন কেন্দ্রীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণের বদলে এগুলিকে ব্লক স্তরে নিয়ন্ত্রণ করা হত। সাভেজ ২০০০ সালে তাঁর উপরাষ্ট্রপতিকে বলেছিলেন এই চক্রগুলিকে টাকা দিতে, যার ফলে এগুলির স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই চক্রগুলির কাজ পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্যায়ন, গণ সমাবেশ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় সাহায্য এবং সামাজিক সহায়তা। ২০০৩ সালে এই চক্রগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল সর্বাধিক, ২ কোটি ৩০ লক্ষ। যদিও ২০০৩ সালের পর থেকেই ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে এই চক্রগুলির প্রভাব কমতে থাকে এবং আস্তে আস্তে কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

এই বলিভারিয়ান চক্র সাভেজের রাজনীতির প্রসার এবং সামাজিক মান্যতা তৈরির কাজও করত। সমস্ত বলিভারিয়ান চক্র যে সাভেজপন্থী ছিল তা নয়, সেখানে অন্যান্য বাম বিপ্লবী দলগুলিরও প্রাধান্য থাকত। আমরা আগেই দেখেছি, ভেনেজুয়েলায় দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে প্রচুর ছোটো ছোটো বাম বিপ্লবী কমিউনিস্ট সশস্ত্র গেরিলা দল ছিল বা আছে। শহরে এবং গ্রামে। ২০০১ সালে সাভেজ সাভেজপন্থী বলিভারিয়ান চক্রগুলির একটি পুনর্মিলন উপলক্ষে একটি শপথবাক্য পাঠ করান : "আমি আমার পূর্বপুরুষের দেবতার নামে আপনার সামনে শপথ নিচ্ছি। আমি আমার সম্মান ও মাতৃভূমির নামে শপথ নিয়ে বলছি, মাতৃভূমিকে ধ্বংসকারী যে শক্তি ভেনেজুয়েলাকে শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে তাকে না ভেঙ্গে আমি দেহে বা মনে বিশ্রাম নেব না। আমি শপথ করে বলছি, আমি আমার সমস্ত কাজ উৎসর্গ করব বলিভারিয়ান আদর্শ, জনগণের সংগঠন, গণসমাবেশ, জনক্ষমতা, অশেষ লড়াইয়ের কাছে। আমার বলিভারিয়ান চক্রে প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত্রি বলিভারিয়ান জাল, বলিভারিয়ান প্রবাহ, বলিভারিয়ান সমরশক্তি এবং ১৯ শতকের পরে ফিরে আসা বলিভারিয়ান রেভোলিউশনারি মুভমেন্ট ২০০-র, এবং তা জনগনের ইচ্ছায়। বিপ্লবের রক্ষার জন্য আমি নিরলস লড়াই চালিয়ে যাব এবং দরকার হলে ভেনেজুয়েলার জন্য প্রাণও বিসর্জন দেব।"

স্বতঃস্ফূর্ত বিরোধিতা, ওয়াক-আউট, নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করার মধ্যে দিয়ে এগুলি কিছুটা স্বাধীনতা অর্জন করে। এরাই কারখানা দখল, জমিদারি দখলের মতো জঙ্গি পদক্ষেপ নেয় এবং আরও বেশি সংস্কারপন্থীদের সাথে লড়াই চালাতে থাকে। তারা শ্লোগান তোলে, 'বিপ্লব, সাভেজ থাকুক বা না থাকুক'। তবে এই মতামতগুলির সাথে সাভেজদের আদানপ্রদান চলতে থাকে। এগুলির কিছু কিছু ঢুকে যায় সাভেজের 'বলিভারিয়ান বিপ্লব'-এর আদর্শনৈতিক পরিকাঠামোয়, যেমন সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য রূপে নেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির জাতীয়করণ ইত্যাদি।

বলিভারিয়ান চক্রগুলিকে ঘিরে সামাজিক উৎসাহ অনেকটাই স্থিমিত হয়ে আসার পর সরকারের তরফে 'লোকাল পাবলিক প্ল্যানিং কাউন্সিল' গঠনের প্রয়াস নেওয়া হয়, কিন্তু তা খুব সফল হয়নি। এইসময় রাষ্ট্র কর্তৃক তৃণমূল স্তরে ক্ষমতায়নের বিশ্বজোড়া প্রয়াসগুলিকে কিছুটা পর্যালোচনায় আনেন সাভেজ, যার অঙ্গ হিসেবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও পর্যবেক্ষণ করেন। রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের ক্ষমতায়ন বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং মানুষের তরফে জনসংগঠন গড়ে ক্ষমতা হাতে নেওয়া — এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে ঘিরে আলাপ-আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে ভেনেজুয়েলার বাম সমাজতন্ত্রী রাজনৈতিক সমাজ আলোড়িত হতে থাকে। এই আলোড়নে জড়িয়ে পরে ভেনেজুয়েলার বাইরের সমাজতন্ত্রীরাও। এই আলোড়ন থেকেই জন্ম নেয় কমিউনাল কাউন্সিল, নতুন ধরনের জনসংগঠন।

এলিট সমাজে কর্তৃত্ববাদী হস্তক্ষেপ

২০০০ সালের ৩ ডিসেম্বর সাভেজ একটি গণভোট করান এবং এই গণভোটের বিষয় ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থায় শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচনে সরকারের পর্যবেক্ষণ। আইএলও এই গণভোটের তীব্র বিরোধিতা করে। ২০০১ বছরটা প্রেসিডেন্ট ডিক্রি জারি করে শাসন করতে পারে — এই অনুমোদন সাভেজ জাতীয় সভার কাছ থেকে আদায় করে নেন। এই পর্যায়ের শেষের দিকে সাভেজ ৪৯টি ডিক্রি জারি করেন। এই ডিক্রিগুলির মধ্যে ছিল তেল কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের স্বাধীনতা খর্ব, ভূমি সংস্কার। সামগ্রিকভাবে এই ডিক্রিগুলিতে ভেনেজুয়েলার দীর্ঘদিনের সুবিধাভোগী এলিট সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বণিকদের সংগঠন ফেদেকামারাস এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ফেডারেশন সিটিভি একযোগে ব্যবসা ধর্মঘট ডাকে ২০০১-এর ১০ ডিসেম্বর। সাভেজ ২০০১-এর মধ্যে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাগু করে দেন।

ভেনেজুয়েলার এলিট সমাজের বিদ্রোহ ও সামরিক অভ্যুত্থান

সাভেজ যত বাঁদিকে সরতে থাকেন, দেশের এলিট সমাজ — মালিকশ্রেণী, কর্পোরেট মিডিয়া, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারী-ম্যানেজমেন্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পূর্বতন রাজনৈতিক মহিরূহদের সাথে নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজি ও মার্কিন গুপ্তবাহিনীর সহায়তায় তত অস্থির হয়ে ওঠে। এরই অবদান ২০০২ সালের এপ্রিল মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামরিক অভ্যুত্থান। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল কোম্পানির ম্যানেজমেন্টকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ৯ এপ্রিল ২ দিনের সাধারণ ধর্মঘট ডাকে শ্রমিকদের ইউনিয়ন সিটিভি। এরই মাঝে সেনাবাহিনীর একাংশ সামরিক অভ্যুত্থান করে। কর্পোরেট মিডিয়ায় ঘোষিত হয়, ভেনেজুয়েলার নতুন প্রেসিডেন্ট পেদ্রো কারমোনা, যিনি কিনা বণিকসভা ফেডেকামারাস এর সভাপতি। সাভেজের অনুগত সেনাবাহিনীর অংশ তখন গণবিক্ষোভের ডাক দেয়। প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামে। সাভেজের অনুগত বাহিনী রাষ্ট্রপতি ভবন অধিকার করে ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যেয় সাভেজকে ফিরিয়ে আনে। এই সামরিক অভ্যুত্থান এবং সাভেজের পুনরাগমনের বিবরণ পাওয়া যায় তথ্যচিত্র 'রেভোলিউশন উইল নট বি টেলিভাইজড্'-এ। এই সামরিক অভ্যুত্থানে মার্কিন সেনাবাহিনীর নৌবহরের সরাসরি হস্তক্ষেপের তথ্যপ্রমাণ মেলে।

এলিট সমাজের অস্থিরতার দ্বিতীয় অবদান ২ ডিসেম্বর ২০০২ থেকে শুরু হওয়া দু'মাসব্যাপী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থায় ম্যানেজমেন্ট এবং শ্রমিকদের যৌথ ধর্মঘট। দেশের তেল ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সাভেজ তেল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট এবং ১৮০০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেন। পেট্রোলিয়াম দেশের মোট উৎপাদন বা জিডিপি-র প্রায় এক চতুর্থাংশ (২০০২) হলেও সেখানে কর্মসংস্থান খুবই কম, মোট শ্রমবাহিনীর মাত্র ১%। মূল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল কোম্পানির শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাফ মিলিয়ে তা ছিল ৪৫০০০। পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী রামিরেজ বলেন, এই কোম্পানি আপাদমস্তক লাল। যারা সাভেজ সরকারকে সমর্থন করছে

না, তারা চাকরি ছেড়ে দিতে পারে। পারলে তারা মিয়ামি চলে যাক। সাভেজ তাঁকে সমর্থন করে বলেন, একথা রামিরেজের দিনে ১০০ বার শ্রমিকদের বলা উচিত।

এলিট সমাজের অস্থিরতার তৃতীয় অবদান সংবিধান মোতাবেক সাভেজকে ফিরিয়ে নেবার দাবিতে গণভোটের বন্দোবস্ত করা। এরই মাঝে সাভেজ বয়স্ক সাক্ষরতা ও উচ্চশিক্ষার জন্য উদ্যোগ নেন। আদিবাসীদের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্যও আলাদা পদক্ষেপ নেন। ২০০৪ সালে সাভেজকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ২০ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা পড়ে, এবং তার ভিত্তিতে ভোট হয় আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে। প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ 'না' ভোট দেন। এই ভোটের ফলাফলকে মিথ্যে আখ্যা দেয় এলিট সমাজ। তাতে সাথ দেন আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমআইটির দুই অধ্যাপক।

২০০৪–২০০৬

২০০৪–২০০৬ সালের মধ্যে সাভেজ নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেন :

- ২০০৫ সালে কর্পোরেট মিডিয়ার কার্যকলাপের ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়।
- সারা দেশ জুড়ে কিউবার ডাক্তারদের সহায়তায় নতুন ধরনের স্বাস্থ্যকাঠামো তৈরি এবং তাতে সরকারি স্বাস্থ্য খরচের বেশিরভাগটা দিয়ে দেওয়া। এর বিরুদ্ধে পুরনো স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ডাক্তাররা ধর্মঘট করে।
- ৪ মার্চ ২০০৫, সাভেজ লাতিন আমেরিকায় নয়া–উদারনৈতিক উদ্যোগকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
- ২০০৫ সালে সাভেজ ধীরে ধীরে আমেরিকার সাথে সব ধরনের সামরিক আঁতাত ছিন্ন করার দিকে এগিয়ে যান, অস্ত্র কেনা বন্ধ করে দেন, বদলে চীন, রাশিয়া ও ব্রাজিল থেকে অস্ত্র কিনতে শুরু করেন। এছাড়া, মার্কিন আগ্রাসন থেকে দেশরক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে দেশের স্থায়ী সেনাবাহিনী ছাড়াও 'মিশন মিরান্ডা' নাম দিয়ে একটি দেশজোড়া মিলিটারি রিজার্ভ — ২ লক্ষ নাগরিক মিলিশিয়া — তৈরির উদ্যোগ নেন। এসময়েই মার্কিন কর্তাব্যক্তিদের বাচনে ভেনেজুয়েলা সম্পর্কে সেসব উক্তি করা শুরু হয়, যা মার্কিনরা অন্যদেশ আক্রমণের আগে তাদের সম্পর্কে করে থাকে। সাভেজ তাঁর প্রতিটা বক্তৃতায় মার্কিন শাসকদের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন।
- ২০০৫–এর অক্টোবরে সাভেজ, যিনি নিজে একজন ক্যাথলিক খ্রীস্টান, সিআইএ–র সাথে আঁতাতের অভিযোগে একটি খ্রীস্টান ধর্মীয় সংগঠন নিউ ট্রাইব মিশনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।
- ৬৮০০ বর্গকিমি এলাকা যা আদিবাসীদের বসবাসের জায়গা, সাভেজ তা তাদের নামে দিয়ে দেন, যদিও ওই জমি কেনাবেচা করা যাবেনা।
- ২০০৫–এর নভেম্বর মাসে 'ফ্রি ট্রেড এরিয়া অফ্ আমেরিকা' বা এফটিএএ–র বদলে সাভেজ তাঁর নিজের ও কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর তৈরি করা 'বলিভারিয়ান অল্টারনেটিভ অব আমেরিকাস' বা আলবা নামক বাণিজ্য চুক্তির কথা বলেন।

কমিউনাল কাউন্সিল

বলিভারিয়ান চক্র বা লোকাল পাবলিক প্ল্যানিং কাউন্সিল, কোনটাই ঠিক মানুষের সংগঠন হয়ে থাকতে পারছিল না। হয় কোন রাজনৈতিক দল অথবা সরকারের বশংবদ হয়ে যাচ্ছিল। হয়ে যাচ্ছিল চলতি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিলিপি, আমলাতন্ত্রের আধার। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে একদল বিপ্লবী যারা আগে কুমানা শহরে সোসালিস্ট লিগের সাথে যুক্ত ছিল, তারা কাজ শুরু করে কমিউনাল কাউন্সিলের এবং 'জন অংশগ্রহণ ও সামাজিক উন্নয়ন' মন্ত্রককে জানায় তাদের পরিকল্পনার কথা। তারা তাদের ইস্তাহারে বলে "নতুন গণতন্ত্র তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে যদি না তা কমিউনাল কাউন্সিলের শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়।" সাভেজ সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই কমিউনাল কাউন্সিলের ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে দেয় এবং একটি পৃথক কমিশন গঠন করে কমিউনাল কাউন্সিলের একটি আইনগত রূপ দেয়। এই কাজে সহায়তা করে ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি। [দ্রষ্টব্য সংযোজনী ৩]

কেমন চলছে কমিউনাল কাউন্সিল?

পর্যবেক্ষণ ১। জোশ লারনার, জেড ম্যাগাজিন

'এল পাজোনেল বলে একটা ছোটো কৃষিভিত্তিক গ্রামের মানুষেরা একটা কমিউনাল কাউন্সিল তৈরি করেছিল কাউন্সিল আইন পাশ হবার আগেই। গ্রামটির ৬০টি ঘরের কোনটিতেই কোন জলের সংযোগ ছিল না, একটা মাত্র পাকা রাস্তায় কোন বাসস্টপ ছিল না, একটা মাত্র ময়লা ফেলার জায়গা সবসময় ভর্তি থাকত। স্বাভাবিকভাবেই কাউন্সিল প্রথমেই এগুলির দিকে নজর দেয় এবং একটি প্রস্তাব পেশ করে ফান্ডের জন্য। ফান্ড পাওয়া গেছিল খুব অল্প, কেবল মালমশলা ও একজন আর্কিটেক্টের জন্য। গ্রামের মানুষেরাই মালমশলা বয়ে নিয়ে আসত অকুস্থলে, একটু উঁচু জায়গায়, জলের ট্যাঙ্ক তৈরির জন্য, তা তৈরি করতেও শুরু করেছে গ্রামের মানুষরাই। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গেল, জলের ট্যাঙ্কের দায়িত্ব কার? সরকারের না গণ–অংশগ্রহণের? মানুষের এই বিনা বেতনের পরিশ্রমের ওপর কি নির্ভর করা উচিত? কতটা কাজ হবে স্বেচ্ছাশ্রমে আর কতটা হবে বেতনভুক শ্রমে? নাকি কমিউনাল কাউন্সিলই এভাবে তার কমিউনিটির অভাব অভিযোগের যতটা পারবে দায়িত্ব নেবে? এ প্রসঙ্গে কমিউনাল কাউন্সিলের একজন সমালোচক বলেন, "কমিউনাল কাউন্সিল শুধু এটুকুই বলতে পারে, আমাদের একটা সিঁড়ি দরকার, সিঁড়ি তৈরির প্রকল্প করা তাদের কাজ নয়।" স্বেচ্ছাশ্রম কখনও কখনও অংশগ্রহণের এবং স্বাবলম্বনের চেতনা দেয়, কিন্তু যে কাজের জন্য অন্যত্র কন্ট্রাক্টররা টাকা পাচ্ছে, সেখানে কাউন্সিলের স্বেচ্ছাশ্রমিক, যারা যথেষ্ট গরিব, তারা কেন টাকা পাবে না?

কাউন্সিলগুলির মধ্যে যেগুলিতে নির্ধারকভাবে সাভেজপন্থীদের সংখ্যাধিক্য, সেখানে সাধারণ সভার আগেই মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় কী কী চাওয়া হবে সরকারের কাছে। অর্থাৎ মিটিং হবার আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। এসব জায়গায় অন্যমতের বড়ো একটা জায়গা থাকে না। তবে সব জায়গায় তা হয়নি। সেখানে অ্যান্টি সাভেজ গোষ্ঠীও সক্রিয় হয়েছে এবং দেখা গেছে যে সাধারণ সভায় এসে সিদ্ধান্ত পাল্টে যাচ্ছে, সাভেজপন্থীরা যা ভেবে আসছেন, তা সবসময় হচ্ছে না। তাই প্রশ্ন একটা থেকেই যাচ্ছে যে কীভাবে এই ভিন্নমতকে জায়গা দেওয়া হবে। কী হবে ভিন্নমতের ক্ষেত্রে? ভিন্ন ধরনের স্বার্থের ক্ষেত্রে? সরকার এর একটা আংশিক সমাধানসূত্র বের করেছে। যতটা পারো ছোটো অংশগ্রহণমূলক সংস্থা তৈরি করো।

যাতে তার ভেতর বড়ো ধরনের ভিন্নমত যতটা সম্ভব কম হয়। যেহেতু কাউন্সিলগুলি মাত্র কয়েকশ' পরিবার নিয়ে তৈরি, তাই সেগুলির সভ্যদের সামাজিক-অর্থনৈতিক মান, আচরণগত মান, এবং রাজনৈতিক নৈকট্য একই রকম হবার কথা। তাছাড়াও যেহেতু বাসিন্দারা নিজেরাই ঠিক করতে পারে তাদের কাউন্সিলের সীমানা কতটা হবে, তাই একই মানসিকতার মানুষদের নিয়ে তা তৈরি হবার সম্ভাবনা বেশি। এভাবেই কমিউনাল কাউন্সিলগুলি রাজনৈতিক বিজ্ঞানীদের ভাষায় 'ইউনিটারি ডেমোক্রেসি' তৈরি করছে। যেখানে মোটামুটি সমস্বত্ব ধরনের মানুষেরা তাদের সাধারণ স্বার্থের ওপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। মতবিভেদ সমাধানের বদলে এক্ষেত্রে মতবিভেদের সম্ভাবনা কমিয়ে দেওয়া হল। যখন কাউন্সিলগুলি আভ্যন্তরীণভাবে কোন বিষয়ে সম্মত হয়, তখন তারা ভেনেজুয়েলার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের রাজনৈতিক বা শ্রেণীগত তর্কগুলি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। কিন্তু কাউন্সিলগুলি এই মতবিভেদেও অংশ নিতে শুরু করেছে, ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে আলোচনার মধ্যে দিয়ে, জেলা কাউন্সিলে এবং মিউনিসিপালিটির অংশগ্রহণমূলক বাজেটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে। কিন্তু বাস্তবে খুব একটা বেশি শহরে এই ধরনের অংশগ্রহণমূলক বাজেট ব্যবস্থা নেই, জেলা কাউন্সিলও নেই। তাই আন্তঃ কাউন্সিল সহযোগিতা কীভাবে কাজ করবে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। দ্বন্দ্বের জায়গাগুলির কীভাবে মীমাংসা হবে, তা দেখার আছে।

সান্টা রোজা দি লিমায় তিনজন মহিলা, কাউন্সিলরের সাথে মিটিং শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুঁসি পাকিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল, তাদের অঞ্চলে তৈরি হতে থাকা বিশাল ২৫ তলা আবাসনটির কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ তা তাদের কমিউনিটির চরিত্র নষ্ট করে দেবে। কাউন্সিলার তাদের বোঝাতে চাইলেন, শহরে যেভাবে বাসস্থানের চাহিদা বাড়ছে, তাতে করে এটা তাদের তৈরি করতেই হবে। তবুও মহিলা তিনজন নাছোড়। যখন কাউন্সিলর আর কিছুতেই শুনছেন না, তখন তারা বলল, ''আমাদের কথা আপনাকে মানতেই হবে, কারণ আমাদের অঞ্চলের সিদ্ধান্ত এটাই''। তাদের কমিউনাল কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই আইনমতেই তারা এই দাবি করতে পারে।

কিন্তু সত্যিই যদি শহরে বাসস্থানের অভাব থাকে, আর কমিউনাল কাউন্সিল যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে এলাকায় আবাসন তৈরি করা যাবে না, তাহলে তা কতদূর গণতান্ত্রিক? কী হবে যখন একটি এলাকার সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে শহরের বা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে? যদি তা সরকারের পূর্বতন কোন সিদ্ধান্তের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পরে তাহলে কী হবে? স্থানীয়, আঞ্চলিক, শহরের, রাজ্যের এবং জাতির স্বার্থের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য রাখা যাবে? ফান্ডিং নিয়ন্ত্রিত হয় রাজধানী থেকে সরাসরি। সমালোচকরা সাবধান করে দিয়েছেন, এর ফলে শহরের প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনকে এড়িয়ে চলার মাধ্যমে একটা সামূহিক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ক্ষমতা তৈরি হবার সম্ভাবনা আছে। বাস্তবতও কমিউনাল কাউন্সিল মধ্যস্তরীয় প্রশাসনকে এড়িয়ে চলতে পারবে না। কারণ, তার স্বার্থ ওগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শহরের এবং রাজ্যের প্রশাসন কাউন্সিলগুলির পরিকল্পনাগুলিকে পাবলিসিটি দেয়, প্রযুক্তিগত সাহায্য দেয়। কাউন্সিলগুলির ফান্ডিং রাজ্য সরকার বা শহরের প্রশাসনকে প্রদত্ত ফান্ডিং-এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকী একটি কমিউনাল কাউন্সিল একবার সেই শহরের মেয়রকে ইমপিচ করার প্রস্তাব নেয়।

আন্দিজের পৃষ্ঠদেশে এল পাজোনেলের কাছেই আর একটা গ্রাম লস কামেলনস্, সেখানে মূলত কৃষিজীবি জনতার বাস এবং কিছু মানুষ আছে, যারা ট্যুরিজমের ওপর নির্ভরশীল। কাউন্সিল আইন ঘোষণার পূর্বেই তারা একটি কাউন্সিল তৈরি করে, অনেক সদস্য করিয়ে নেয়। কাউন্সিল আইন তৈরি হবার পরেই তারা সেখানে একটা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তৈরির জন্য ফান্ডিং-এর আবেদন জানায় ও পেয়ে যায়। কিন্তু সে অঞ্চলের বেশিরভাগ বাসিন্দাদের আরও বেশ কিছু গুরুত্বের বিষয় ছিল, যেমন নিকাশী ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা। সেই কাউন্সিলটায় প্রাধান্য ওই ট্যুরিজম পেশার লোকেদের। ঐ কাউন্সিলের মুখপত্র এ ব্যাপারটা মেনে নিলেন, বললেন, আমরা শুনি, তর্ক করি, বোঝানোর চেষ্টা করি, তাতেও না হলে ভোটে মীমাংসা করি। কমিউনাল কাউন্সিলের নিয়মগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। অনেকের কাছেই এই আইনগুলি, তার জটিলতা বেশ গুরুভার। একজন তো বলেই ফেললেন, ''একটা কমিউনাল কাউন্সিল তৈরি করতে গেলে কিছু আইন ভাঙতেই হবে। এর ডিজাইনাররা জানেই না বাস্তবে কাজটা করা ব্যাপারটা কী।'' ১৪০০০ ডলারের ফান্ডিং-এর সীমা অনেক ক্ষেত্রেই ভীষণ কম। আবার অনেকে বলে, আইন অপর্যাপ্ত এবং অপরিষ্কার, যা থেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা তৈরি হয়, কখনও কখনও অসাম্য। যেমন একই আয়তনের দুটি এলাকায়, কেউ একটিতে চারটি কাউন্সিল তৈরি করতে পারে চারগুণ বেশি ফান্ড পাওয়ার জন্য। কোন অফিসিয়াল শর্ত তো নেই ফান্ডিং-এর এবং কীসের ভিত্তিতে ফান্ডিং হয় তাও পরিষ্কার নয় আইনে।

এটা একটা চ্যালেঞ্জ। কীভাবে এই 'খুব কম' এবং 'খুব বেশি' আইনের ধারণার ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে? কীভাবে তৈরি হবে নতুন নতুন আইন? কে তৈরি করবে? কীভাবে তার পরিবর্তন হবে? কতদিন পর পর? আইন রূপায়ণে কাউন্সিল কতটা নমনীয়তা দেখাবে? এর কোন ছকে দেওয়া উত্তর নেই। কাউন্সিলগুলি চলমান পরীক্ষা-নিরিক্ষা। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যে আইনের চেয়েও দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে বাস্তবতা। এর মানে এই নয় যে কমিউনাল কাউন্সিল এবং তার আইনগুলি ভুল ব্যাপার। হয়ত অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের বিশালাকার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন ঘন ঘন পরিবর্তন। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগও চলছে, আইন পরিবর্তনের এবং বদলে যাওয়া বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেবার মতো করে। প্রয়োজন ইনফর্মাল আইনগুলিকে ফর্মালাইজ করা। সমালোচকরা বলছেন, প্রয়োজন কাউন্সিলগুলির আরও বড়ো ভূমিকা নেওয়া, প্রয়োজন আইন প্রণয়নের, যেহেতু তারা বাস্তব অবস্থাটা সবচেয়ে ভালো জানে।

ভেনেজুয়েলায় কমিউনাল কাউন্সিলের অনেক অনুগামী আছে। কিন্তু সব জায়গায় অবস্থাটা একরকম নয়। কাটিয়া জেলার একটা কাউন্সিলের প্রথম মিটিংয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা, বেশিরভাগ মানুষ তাদের কাজ সেরে বাড়ি চলে গেল, কয়েকজন মাত্র এল মিটিংয়ে। সাকুল্যে সংখ্যাটা দাঁড়ালো এগারো। তাও যারা এসেছিল তাদের

বেশিরভাগই এসেছিল ভুল করে, একটা নাচের ক্লাস হবে ভেবে।

একটা জাতীয় অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে যে কোন সামাজিক আন্দোলনের তুলনায় যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের তুলনায় বেশি মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা উচিত। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। কী ধরনের মানুষেরা অংশ নিচ্ছে না? কেন নিচ্ছে না? যারা অংশ নিচ্ছে, তারা কেন নিচ্ছে? কখন মনে হবে না যে বড্ড বেশি সন্ধ্যে এই মিটিংয়ে অংশ নিয়ে ব্যয় করা হচ্ছে? এ প্রশ্নগুলি আরও গভীরের কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়। কতটা অংশগ্রহণ পর্যাপ্ত? সেটা হয়ত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু কতটা অংশগ্রহণ হলে বলা যাবে যে সমাজের বিভিন্ন অংশের স্বার্থ প্রতিফলিত হচ্ছে কমিউনাল কাউন্সিলে? যদি নির্দিষ্ট কিছু অংশের মানুষের অংশগ্রহণ না হয়, তাহলে বলতে হবে, অংশগ্রহণ অপর্যাপ্ত। ভেনেজুয়েলান সরকার এবং কাউন্সিলগুলি বেশ কিছু উপায় বার করেছে এই বেশি বেশি অংশগ্রহণকে উৎসাহপ্রদান করার (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিরুৎসাহকরণের)। প্রথমত কাউন্সিলগুলির হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান। স্ব-প্রশাসন প্রচুর মানুষকে এমনিই আকর্ষণ করে। এবং তার ইনসেনটিভও আছে। টাকা। টাকা পাওয়া যায় এলাকার উন্নয়নের জন্য। যেহেতু খুব ছোটো কাউন্সিল, তাই যে কোন মানুষেরই কথার একটা গুরুত্ব থাকে এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে। তবে ভেনেজুয়েলার টাকা আছে বলেই তা সম্ভব হচ্ছে। আরেকটা ইনসেনটিভ হল এই টাকা প্রদানের অনুষ্ঠানটির জাঁকজমক। এই অনুষ্ঠানগুলিকে বলে গাবিনেত মোভিল, যেখানে সাভেজ নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে টাকা তুলে দেন। এই উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানগুলি মিডিয়াকে আকর্ষণ করে এবং মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ যোগায়। এটা আবার তাদের মোহভঙ্গও করে, কারণ নিন্দুকেরা বলে, এটা সংকীর্ণ ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুষ্ঠান।

কখনও কখনও মজাদার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয় এইসব কাউন্সিল মিটিংয়ে। নাচ, গান, খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে। আবার কিছু কাউন্সিল আছে যেগুলি এই ধরনের ব্যাপার পছন্দ করে না, তারা গম্ভীর মিটিং করে, লম্বা লম্বা বক্তব্য চলে। সরকারের তরফে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য। এখানে অংশগ্রহণকে তাদের কাজের অন্তর্গত করে ফেলা। এভাবে তার ফ্রি সময় হরণ করা হল না। সহ-মন্ত্রী মোতা বলছিলেন, "আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে মালিকেরা তাদের কর্মচারীদের সপ্তাহে কাজের থেকে দু'ঘন্টা সময় দেন, কমিউনাল কাউন্সিলের মিটিং এ অংশ নেওয়ার জন্য। এটা কমিউনিটি সার্ভিসের মতো করে আমাদের সাজাতে হবে।" এর ফলে কর্মরতদের নিজেদের কমিউনাল কাউন্সিলে বেশি বেশি করে অংশ নেওয়ানো যাবে। মোতা স্বীকার করলেন, তাঁর নিজেরই সময় নেই নিজের কমিউনাল কাউন্সিলে অংশ নেওয়ার।'

পর্যবেক্ষণ ২। ভেনেজুয়েলান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি এবং নাগরিক অংশগ্রহণের কমিশনের সভাপতি ডেভিড ভেলাসকেজ

'কমিউনাল কাউন্সিল তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পদের পরিচালনের থেকে বেশি কিছু। তাদের কাজের মধ্যে পড়ে তাদের অঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার পড়ে থাকা বিল্ডিংগুলির পুনরুজ্জীবন। এগুলি আঞ্চলিক গার্ডের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্ব এবং সংহতিতেও ভূমিকা পালন করবে।... কমিউনাল কাউন্সিল হল আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার (constituent power) উদাহরণ, যা অর্পিত সাংবিধানিক ক্ষমতার (constituted power) পরিপূরক। এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন ধরনের রাষ্ট্র তৈরিতে সহায়তা করবে, যা বলিভারিয়ান বিপ্লবের প্রক্রিয়া থেকে উঠে আসা প্রয়োজন। এর মানে হল আমাদের মেয়র অফিস, মিউনিসিপাল কাউন্সিল এবং অন্যান্য স্থানীয় কাউন্সিলগুলির কার্যকলাপে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। যদি আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়তে চাই, তাহলে আমাদের এই ব্যবস্থার অনুগত একটি রাষ্ট্রীয় উপরিকাঠামোও তৈরি করতে হবে।'

নতুন কৃষি সমবায়

বর্তমানে ভেনেজুয়েলার ৮৫ ভাগ নরনারী বাস করে শহরে। গত শতকের গোড়ার দিকে তেলের খনিগুলি আবিষ্কার হবার পর থেকেই গ্রাম থেকে শহরের অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়। তারপর শহুরে সংস্কৃতি বা শিল্প-বাণিজ্যের সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। বলিভারিয়ান সংবিধানের জমি আইন (২০০১)-এর হাত ধরে শহরের গরিবেরা আবার জমির দখল নিতে শুরু করে। একই সঙ্গে বড়ো বড়ো ভূমিখণ্ডের মালিকেরা তাদের আক্রমণ করতে শুরু করে। এই জমি দখল আন্দোলনের ১৫০ জন নেতাকে গত পাঁচ বছরে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এর জন্য শাস্তি হয়েছে খুব কম। ভূমিহীন এবং চাকরিহীন গরিবরা এই অকর্ষিত জমিগুলির দখল নিক, তাতে তারা সমবায়ে চাষ করুক এবং ভাগাভাগি করে মালিকানা কায়েম করুক — নতুন সংবিধানে এব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এতদিনকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মালিকানা, নাগরিকত্ব, ব্যক্তিগত অধিকারের পরিবর্তে এক ধরনের নতুন কৃষি কালেকটিভ এবং কৌম (কমিউনিটি) গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটির নাম অন্তর্জাত বিকাশ (endogenous development)।

পশ্চিম ভেনেজুয়েলার মেরিডা রাজ্যের মারাকাইবো হ্রদের দক্ষিণে এরকমই এক দখল করে গড়ে ওঠা কৃষি কালেকটিভ বেভার (Bevere)। সেখানে ৪৫টা পরিবার আছে, যারা ২০০ হেক্টর জমি চাষ করে। যদিও এটা একজন ব্যক্তিমালিকের সম্পত্তি, কিন্তু তা পরে ভালভাবে বিবেচনার পর রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানায় চলে আসে। ২০০৩ সাল থেকে এই জমি দখল করে চাষ করছে ওই ৪৫টি পরিবার। এই সমবায়ের ডিরেক্টর মিগুয়েল বাসাবের একটি সাক্ষাৎকার, 'ভেনেজুয়েলা অ্যানালিসিস ডট কম' ওয়েবসাইটের পক্ষ থেকে নেওয়া :

প্রশ্ন : অন্তর্জাত বিকাশ ব্যাপারটা কি?

উত্তর : এই কথাটা আমরা কিছুদিন ধরে শুনছি। আমার কাছে ব্যাপারটা হল, মানুষের সামাজিক সু-অস্তিত্বের উন্নতির জন্য তার কিছু মৌলিক সক্ষমতার উন্মেষ ঘটানো এবং পরবর্তীতে তার কাছে যতটা সম্পদ আছে তার মাধ্যমেই উৎপাদন করা। কী সম্পদ? জল, জমি এবং এসব যা আমরা পেয়ে থাকি এমনিই। যেমন, বেভারের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, বেভারের অন্তর্জাত বিকাশ হল মানব অস্তিত্বের রূপান্তর। আমার মনে হয় পরিবর্তন শুরু করতে হয় এখান থেকেই, আগে নিজেদের বদলে ফেলো। তার মানে কী? ধারণার পরিবর্তন, চিন্তার ধরনের পরিবর্তন, আচরণের ধরনের পরিবর্তন। আমাদের ভিতর থেকে

শুরু করে এবং আমাদের সক্ষমতায় — জ্ঞানে, পরম্পরাগত লোকজ্ঞানে, বিচিত্র উৎপাদনে তার প্রকাশ। বেভারের ক্ষেত্রে এর ভাষান্তর কী? বৈচিত্রময় উৎপাদন, যেমন ফল, দানাশস্য, পশুপালন, জৈব সারের উৎপাদন, জৈব বস্তুর উৎপাদন, চাষের প্রকৃতি-পরিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণে লোকজ্ঞান, যেমন কারিগরি কাজ এবং সংস্কৃতির ব্যবহার। অর্থাৎ সেই সমস্ত জ্ঞানের ব্যবহার, যা আমাদের নিজেদের ভিতর থেকেই সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। আমার কাছে এটাই হল অন্তর্জাত বিকাশ — ভিতরের থেকে বাইরের দিকে সৃজন।

প্রশ্ন : এই সমবায়ের কাজটির একটা বিবরণ দিতে পারেন?

উত্তর : দখল করার সময় থেকেই আমরা সমবায়িক ভিত্তিতে কাজ করার জন্য ব্রতী হয়েছিলাম। কখনও আমরা আংশিক মালিকানা বা জমিটাকে খণ্ড করার কথা ভাবিনি। আমরা দায়িত্ব ভাগাভাগি করেছি। এখন আমাদের প্রতিটি চাষের এলাকার জন্য একজন করে দায়িত্বশীল লোক আছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে, কারণ সে একটা রেজিস্টার রাখে — কে কী করছে, কীভাবে করছে, কত খরচ করছে, কীসের জন্য খরচ করছে এবং কত মানুষ লাগছে তার হিসেব থাকে ওতে। আমাদের আরও একটা লোক থাকে যার দায়িত্ব যেখানে আমরা জিনিসপত্র রাখি সেখানটার। তার কাছে একটা তালিকা থাকে, সেখান থেকে কোন কোন জিনিস (tool) নেওয়া হচ্ছে এবং ফেরানো হচ্ছে। এটা আমাদের এখানে খুব সফল ভাবে হয়েছে। এটা পুরোপুরি একটা সংঘবদ্ধ কাজ এবং সুন্দর অভিজ্ঞতা। ভেনেজুয়েলায় বড়ো একটা সমবায়ভিত্তিক কাজের অভিজ্ঞতা নেই, সফল অভিজ্ঞতা তো নেইই। প্রতিটি ডিরেক্টরেরও নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মধ্যে দিয়েই প্রতিটি সমবায়কারী কুশীলব হয়ে ওঠে, তাকে আর দ্বিতীয় সারির লোক হয়ে থাকতে হয় না।

প্রশ্ন : লোকে কেন পুঁজিবাদী কর্ম সম্পর্ক ছেড়ে সমবায়ভিত্তিক কাজ করছে?

উত্তর : আসলে আমাদের কাছে এটা সরকারের ঘোষিত নীতি মোতাবেক কাজ করা। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের নীতি হল, যার নাম ফান্ডোস জামোরানোস, সংঘবদ্ধ কাজ এবং সংগঠন। আমরা প্রথম ডিরেক্টররা একেবারে এই নীতি মেনে কাজ করি। যার ফলে যারা আমাদের সমর্থক তারাও এটা অনুসরণ করবে।

প্রশ্ন : কিন্তু আপনাদের এই সমবায়টি সরকারের নীতি ঘোষিত হবার আগে থেকে আছে। তার মানে কি, সাভেজ সরকার আসার আগে থেকেই সমবায় উদ্যোগের কোন বাস্তবতা ছিল?

উত্তর : জমি পাওয়ার আগে আমাদের কোন সংগঠন ছিল না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় থাকতাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে। জমি পাবার পর আমরা একসাথে কাজ করা শিখলাম। যখনই আমরা একসাথে কাজ করা, বাঁচা শিখলাম তখনই আমাদের কাছে অন্য সামাজিক সম্পর্কের দিকটা খুলে গেল। তাই বাস্তবতঃ এই সমবায়িকতা ভেনেজুয়েলায় কতগুলি মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখল, যেমন পারস্পরিক সহযোগিতা, সাহচর্য, সংহতি, সহমর্মিতা এবং কৌমের স্বার্থ। এই প্রক্রিয়ায় আমরা কৌমের প্রতি দায়বদ্ধতা দেশের প্রতি আনুগত্য, এবং বর্তমান সরকারের পরিবর্তনের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছি।

প্রশ্ন : আপনারা কীভাবে জানলেন যে এই জমিটা রাষ্ট্রের এবং এটা ব্যক্তিমালিকানাধীন নয়?

উত্তর : এর জন্য যে কোন জমি সম্পর্কে জাতীয় জমি প্রতিষ্ঠান (NTI)-এ একটা আবেদন করতে হয় একথা বলে যে, এই জমিটা পতিত। তখন জাতীয় জমি প্রতিষ্ঠান ওই জমিটাতে প্রযুক্তিগত সমীক্ষা চালায়। তাতে যদি বেরোয় যে ওই জমিটা উৎপাদী জমি, তাহলে তার মালিককে স্বীকার করে নিতে হয়। যদি ওই জমিটার কোন কাগজপত্র না দেখাতে পারে মালিক, তাহলে তার সাথে দরকষাকষি হয়। আর যদি ওই জমি পতিত হয়, তাহলে তা সরকার খাস করে নেয়।

প্রশ্ন : এই মালিকদের সঙ্গে কখনও ঝামেলা হয় না?

উত্তর : হয়, এদেশের কিছু কিছু জায়গায় মালিকেরা জমিগুলিকে সরকারের সম্পত্তি বলে মেনে নিতে চায়নি। কারণ এই সরকার আসার আগে যে সরকার ছিল, তার সময়ে এটাই নিয়ম ছিল, যার টাকা আছে সে জমি রাখত এবং আরও জমি কিনত। এখন ব্যাপারটা বিপরীত।

সরকার এসে বলল, আমাদের ভূমিহীন চাষিদের জন্য জমি প্রয়োজন, কিন্তু কীভাবে তা পাওয়া যাবে? প্রথমে কোনো জমির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে হবে, বলতে হবে, জমিটা সরকারের, বর্তমান মালিকের নয়। কোন কোন মালিক মনে করত, জমিটা তাদের। তারা ভাবতেও পারত না যে সরকার কখনও তাদের জমি কেড়ে নিতে পারে। তাই তাদের অনেকের কাছেই কোন কাগজপত্রও ছিল না। তারা তাদের সম্পত্তি বাড়িয়ে যেত এসব সরকারি জমিতে ভাড়া খাটিয়ে, কখনও চাষীদের কাছ থেকে এমনকি বাজারের মূল্যের থেকেও কম দামে জমি কিনে। এসব কিছুই হত না খাতায় কলমে। ফলে তারা কাগজপত্র না দেখাতে পারায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার শিকার হয় এবং শেষমেষ জমিটা আসে সমবায়িদের হাতে। কিন্তু কিছু কিছু মালিক তা মেনে নিতে চায় না, তাই তারা আক্রমণ চালায় ভূমিহীন কৃষকদের উপর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মালিকানা না ছাড়তে চাওয়াটা একটা সাংস্কৃতিক সমস্যা। বছরের পর বছর ধরে তারা বিশ্বাস করে এসেছে যে এই জমি তাদের এবং কারোর ক্ষমতা নেই তা নিয়ে নেওয়ার। এই সরকার তাদের পক্ষ তো নিচ্ছে না-ই, বরং জমি কেড়ে নিতে আসা লোকেদেরই পক্ষ নিচ্ছে। তাই তারা রাজি হচ্ছে না। কেননা তারা বেশ বুঝতে পারছে যে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাচ্ছে। ...

প্রশ্ন : শোনা যায় নাকি প্রায় ১৫০ জন ভূমিহীন কৃষক নেতা খুন হয়েছে?

উত্তর : আমরা যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করি তারা জানি যে ১৫০ জন খুন হয়েছে। সরকারের কাছে থাকা সংখ্যাটা অবশ্য আলাদা। কম। এবং এইসব খুন তারাই করিয়েছে, যাদের জমি আছে এবং যারা সরকারের সাথে একমত নয়, সরকারের নীতির সাথে একমত নয়। তারা অনেক টাকা ঢেলেছে এক একটা খুনের পিছনে। আমরা আমাদের লড়াই, সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয়, সরকার দোষীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে?

উত্তর : আমার মনে হয় সরকারের সদিচ্ছা আছে, কিন্তু সমস্যাটা আমলাতন্ত্রকে নিয়ে। অনেক প্রতিষ্ঠানের আইন এখনও বাস্তবসম্মত নয়। আমলাতান্ত্রিক কাগুজে কাজ বড়ো দীর্ঘসূত্রী। এর ফলে সময়মতো কাজ হচ্ছে না, ফলে অনেক হত্যাকারী পালিয়ে যাচ্ছে। এটাই বাস্তব।

প্রশ্ন : সামরিক বাহিনী কি ভূমিহীন কৃষকদের সাহায্য করছে?

উত্তর : ভেনেজুয়েলার সামরিক বাহিনীর মধ্যে অনেক ধরনের প্রক্রিয়া

চলে। তাই যখন এই জমি আইন লাগু করার ব্যাপার আসে, তখন আমরা সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সাহায্য পাইনি। কিন্তু গত দেড় বছরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ২০০২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পরে সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঝাড়াইবাছাই প্রক্রিয়া চলে। এর মাধ্যমে এখন সেনাবাহিনী বেশ কিছুটা মানুষের অনুগামী, সংবিধানের অনুগামী এবং অবশ্যই রাষ্ট্রপতির অনুগামী হয়েছে। ২০০০, ২০০১ সালের সেনাবাহিনীর উচ্চতর অংশ এমনটা ছিল না।

প্রশ্ন : বছরখানেক আগে কারাকাসে এই খুনগুলি নিয়ে একটা প্রতিবাদ হয়েছিল, না?

উত্তর : ২০০৫-এর ১২ জুলাই। ১৫০ জনের খুনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আমরা প্রায় ৬০০০ জন এজেকুয়েল জামোরার নেতৃত্বে রাস্তায় হেঁটেছিলাম। এছাড়া, যারা খুন হয়েছে তাদের পরিবারের সামাজিক ন্যায় পাওয়ার ব্যাপারটাও ছিল। এটার ফলে জাতীয় স্তরে সরকারের সঙ্গে একটা কথাবার্তা বলার পরিসর তৈরি হল। তারপর থেকে আমরা এই পরিসরটাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন মিটিং, বোঝাপড়া করছি। ...

শিল্প ও শিল্প শ্রমিক, মালিক এবং পরিচালক

ভেনেজুয়েলার সংগঠিত শ্রমিকদের আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবেই খুব দুর্বল। ২০০২ সালে সাভেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তেল শিল্পের শ্রমিকরা। এই আন্দোলন এবং সাভেজের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন অব ভেনেজুয়েলান ওয়ার্কার্স বা সিটিভি-র নেতৃত্বে। ২০০৩ সালে সেখানে নতুন জাতীয় ইউনিয়ন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৈরি হয় ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ওয়ার্কার্স বা ইউএনটি। ২০০৫ সাল থেকে শ্রমিকদের দ্বারা কারখানা পরিচালন বা 'কো-ম্যানেজমেন্ট' প্রচলন করার চেষ্টা ব্যাপক চেহারা নেয়। সাভেজ চলমান বিপ্লবে শ্রমিকদের আগুয়ান ভূমিকা নিতে আহ্বান করেন। কিন্তু বিপ্লব যত দ্রুত চলতে থাকে, শ্রমিক আন্দোলন তত দ্রুত বিকাশ লাভ করতে পারেনি। শ্রমিক ক্ষমতাও বিকশিত হয়নি।

ফেডেরিকো ফুয়েন্তেস অস্ট্রেলিয়ার একটি শ্রমিক ইউনিয়নের কাউন্সিলের তরফে পাঠানো এক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ভেনেজুয়েলা গেছিলেন। তাঁর ২০০৬ সালের পর্যবেক্ষণ।

'ইউএনটি-র সবাই স্বীকার করছে যে এই মুহূর্তে এই ইউনিয়নে পাঁচটা ভিন্ন মত আছে। এই ইউনিয়ন সারা দেশের বিভিন্ন শিল্পের ইউনিয়নগুলির একটি জাতীয় সমঝোতা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত এই ইউনিয়ন ভাগ হয়ে যাবে। গত মে দিবসের জমায়েতে প্রচুর লোক হয়েছিল, প্রায় ১৫ লাখের মতো। কিন্তু সেখানে সর্বজনস্বীকৃত কোন বক্তা ছিল না। কেবল সর্বজনস্বীকৃত একটি খসড়া পাঠ করে শোনানো হয়। যদিও তার মানে এই নয় যে দক্ষিণপন্থী ইউনিয়ন সিটিভি-তে প্রচুর লোক আছে। তাদের মে দিবসের জমায়েতে মাত্র হাজারখানেক লোক হয়েছিল। যাই হোক, ইউএনটি-র মধ্যে বিতর্কের মূল বিষয় দুটি :

১) ট্রেড ইউনিয়ন এবং সরকারের মধ্যে সম্পর্ক, যা সরকারের চরিত্র কী এবং রাষ্ট্রের চরিত্র কী, সে বিতর্ককে টেনে আনছে। বিতর্কে সরাসরি না হলেও যে বিষয়টি আসছে তা হল ইউনিয়নের কাজ কি কেবল সরকারকে সমর্থন করা না কি তার কাজ সরকারের হাত থেকে বা নিদেনপক্ষে রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের হাত থেকে শ্রমিক অধিকারকে সুরক্ষিত রাখা?

২) দ্বিতীয় বিতর্ক সদ্য চালু হওয়া একটা আইনকে ঘিরে। আইনটা হল সরকারি বা বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সারা দেশে শ্রমিক কাউন্সিল তৈরিকে ছাড়পত্র দেওয়ার আইন। এর ফলে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, ইউনিয়নের কাজ তবে কী? তবে কি ইউনিয়নের চেয়েও ওয়ার্কার্স কাউন্সিলের গুরুত্ব বেশি এবং ইউনিয়নের গুরুত্ব তার থেকে কম? পরবর্তী পর্যায়ে কি ইউনিয়ন এবং শ্রমিক কাউন্সিলকে হাতে হাত রেখে চলতে হবে, নাকি ইউনিয়নের কাজকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে? ইউএনটি-র মধ্যে একটি অংশ আছে যারা মনে করছে, এই শ্রমিক কাউন্সিলগুলি শ্রমিক ক্ষমতার সত্যিকারের ক্ষেত্র হবে না, তাই ইউনিয়নের কাজে ঢিলে দেওয়ার কোন মানে হয় না।

এই বিতর্কগুলি এখন এমন একটা পর্যায়ে গেছে যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। সাভেজের লাইনটা হল কেবল সেই কোম্পানিগুলিকেই জাতীয়করণ করা, যেগুলি আগে বেসরকারিকরণ হয়েছিল। বাকিদের ক্ষেত্রে জাতীয়করণের ভয় দেখিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা। যেমন একটি কর্পোরেট স্টিল কোম্পানি 'সিডোর', তারা আগে দেশে স্টিল বিক্রি না করে বেশি লাভের আশায় বিদেশে রপ্তানি করত। সাভেজ জাতীয়করণের ভয় দেখিয়ে এই কোম্পানির সবচেয়ে বেশি শেয়ার যাদের আছে, সেই আর্জেন্টিনার সংস্থার সঙ্গে এক সমঝোতায় এসেছে, যাতে বলা হয়েছে যে এবার থেকে সিডোর বাজার মূল্যের থেকে কম দামে ভেনেজুয়েলায় স্টিল বিক্রি করবে। এছাড়া ভেনেজুয়েলায় প্রচুর ছোটো বড়ো কোম্পানি আছে যেগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে ছিল। সেগুলো শ্রমিকরা দখল করে নিয়ে তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটাচ্ছে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এবং কখনও কখনও তাদের পূর্বতন আইনি মালিকের বিরোধিতা সত্ত্বেও এবং কতকটা আইনের বাইরে গিয়েই।

এছাড়া আর একটা বিষয় নিয়ে এখন মানুষের মধ্যে বেশ কথাবার্তা হচ্ছে, তা হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা তৈরি বিষয়ে। এর মানে হল কীভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোম্পানিগুলি পরিচালিত হবে, যাতে করে তা গণতান্ত্রিক ভাবে পরিকল্পিত এবং জনগণের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থনীতিতে যুক্ত হতে পারে। দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রীয় আমলাবাহিনী, যা সাভেজ পূর্বতন সরকারগুলির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, তার আওতাধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানা এই দাবি পূরণ করতে তো পারবেই না, পক্ষান্তরে পুরনো পেটমোটাদেরই উদরপূর্তি হবে।

বিতর্কটা তাই এখন আর সরকারি কি বেসরকারি সম্পত্তি, তা নিয়ে নয়, কারণ সরকার বারংবার বলেছে, "একবিংশ শতকের নতুন সমাজতন্ত্রে" দুটোই থাকবে। বিপ্লব চাইছে সামাজিক সম্পদ তৈরি করতে, যেখানে সত্যিই জনগণের হাতে উৎপাদনের উপকরণগুলি থাকবে। এটা খুবই নিবিড় একটা আলোচনা কারণ সরকারের মধ্যেই বিভিন্ন মতের শরিকরা আছে। এই আলোচনার একটা অংশ হল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানাগুলির পরিচালনায় শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ। কারোর কারোর মত হল পরিচালনায় কোনভাবেই শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ না থাকা। এখন অন্তত মনে হচ্ছে সাভেজ এই মতটাকেই মদত করছেন। তবে অনেকেই এখনও মনে করেন, কেন শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ প্রয়োজন এবং শ্রমিকদের

অংশগ্রহণ মানে কী তা বোঝানো সম্ভব। এই আইন চালু হবার আগেই অনেক কারখানাতে শ্রমিক কাউন্সিল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যেমন ইনভিভাল। এটা আগেই শ্রমিকরা কাউন্সিল তৈরি করে দখল করে নিয়েছিল, পরে তার জাতীয়করণ হয়। কিন্তু এখনও যেটা পরিষ্কার নয়, তা হল এই কাউন্সিলগুলির ভূমিকা কতটা এবং কমিউনাল কাউন্সিলের সাথে তার সম্পর্কটাই বা কী? ইউনিয়নগুলির মধ্যে কেউ কেউ চিন্তিত শ্রমমন্ত্রীর একটা মন্তব্য নিয়ে, যে, শ্রমিক কাউন্সিলগুলি সুপারভাইজ করবে মাত্র, কর্মক্ষেত্রের সত্যিকারের সিদ্ধান্তগ্রহণের সংস্থা হবে না। এগুলি সবকটাই এখনও বিতর্কের আওতায়। শ্রমিক কাউন্সিলের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক হল শ্রমিক আন্দোলন, যার শ্রমিকদের কাউন্সিলে সংগঠিত করার কথা, সেটা খুবই দুর্বল। এটা একটা উদাহরণ, যেখানে, আইন সংগ্রামের আগে আগে চলছে। সংবিধান শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব থেকে অর্জিত সংগঠনের এবং সচেতনতার থেকে এগিয়ে গেছে। তবে এটা সবসময় বাজে তা নয়, যদি তা সংগ্রামকে উসকে দিতে পারে।

তবে কো-ম্যানেজমেন্টের ধারণাটি বড়ো ধাক্কা খেয়েছে। না ইউনিয়নে, না অফিসিয়ালদের মধ্যে, না মানুষের মধ্যে, কোথাওই কো-ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আর আলোচনা হচ্ছে না। এর একটা কারণ, বিপ্লবের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব 'স্ট্রাটেজিক সেক্টরে' শ্রমিকদের অংশগ্রহণের বিরোধিতা। আরেকটা কারণ, কো-ম্যানেজমেন্ট-এর বিশ্রি অভিজ্ঞতা, যেমন বিদ্যুৎ শিল্পে। সেখানকার শ্রমিকরা কো-ম্যানেজমেন্ট চায়নি তা নয়। তার কারণ সরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি ক্যাডাফের ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে তারা তীব্র বিরোধিতা পেয়েছে। তারা সাবোতেজ পর্যন্ত করেছে। এখন বিদ্যুৎ শিল্পের কোন শ্রমিকদের মধ্যে কো-ম্যানেজমেন্টের কথা যদি উচ্চারণও করা হয়, তার হৃৎকম্প ধরে। তারা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিয়ে কথা বলতে উৎসুক, কিন্তু কো-ম্যানেজমেন্ট নিয়ে নয়। আলকাসা প্রভৃতি কোম্পানিতে এখনও কো-ম্যানেজমেন্ট চালু আছে, কিন্তু তা গভীর সমস্যায়। মানুষ আঙুল তুলছে, আলকাসা-র উৎপাদন ভালো নয়। সে কথাটা সত্যের আংশিক রূপ। কারণ, আগে থেকেই এই কারখানাটির উৎপাদন কম ছিল। এটাকেই বাছা হয়েছিল কো-ম্যানেজমেন্টের পরীক্ষাগাররূপে, কারণ যুক্তি ছিল, যদি এটাতে কো-ম্যানেজমেন্ট সফল হয়, তাহলে বাকিগুলিতেও তা সফল হবে। ক্যাডাফের ৭নং সেক্টরের একটি ছোট্ট জায়গায় এখনও কো-ম্যানেজমেন্ট চলছে। কিন্তু সদ্য তাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে জাতীয় কোম্পানির সঙ্গে, ফলে শ্রমিকদের ভয়, এবার এই কো-ম্যানেজমেন্টটিও ভেঙে যাবে।'

সাভেজের রাষ্ট্রপতিত্বের দ্বিতীয় পর্যায়

৮ জানুয়ারি ২০০৭, সাভেজ দ্বিতীয়বার ভোটে জিতে প্রেসিডেন্ট হবার পর ঘোষণা করেন ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ ছিল প্রথম পর্ব। এরপর ২০০৭ থেকে ২০২১, এটা দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বের নাম জাতীয় সাইমন বলিভার পরিকল্পনা। প্রসঙ্গত, ২০২১ সাল ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার ২০০ বছর। তিনি ঘোষণা করেন, এই পর্যায়ে ১) একটা আইন রুজু করা হবে যার বলে তিনি একবছর ডিক্রি জারি করতে পারবেন। সাভেজ বলেন, কিছু কিছু শিল্পকে পুনরায় সরকারিকরণের জন্য এই আইনটা দরকার। যেমন, টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি CANTV, যা ১৯৯১ সালে বেসরকারিকরণ করা হয়েছিল। তাছাড়া, যে সমস্ত তেল কোম্পানিতে রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু শেয়ার আছে, সেরকম চারটিতে তাকে সংখ্যাগুরু বানানো দরকার। ওরিনোকো তেল অঞ্চলে এই চারটি কোম্পানিতে রাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করে আমেরিকান কোম্পানি ExxonMobil, Conoco ও Chevron, ফ্রান্সের Total, ব্রিটেনের BP এবং নরওয়ের Statoil। এখান থেকে ভেনেজুয়েলার মোট তেলের ১৮ শতাংশ আসে। ২) সাংবিধানিক সংস্কার সাধন। ৩) শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো, যাতে তা পুরনো শিক্ষাব্যবস্থাপ্রসূত ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, পুঁজিবাদী মানসিকতা এবং আত্মম্ভরিতার মূল্যবোধকে সমাজের বুক থেকে দূর করে নতুন মূল্যবোধের জন্ম দিতে পারে। ৪) রাজ্য বা জেলাগুলির সীমার পরিবর্তন সাধন, যার ফলে খুব দরিদ্র অঞ্চলগুলিও অবহেলিত না হয়। ৫) কৌম ক্ষমতা (Communal Power)-র বিস্ফোরণ। এই ক্ষমতা যত শক্তিশালী হবে তত বর্তমানের ক্ষমতার প্রেক্ষাপটটি দুর্বল হবে এবং একদিন তা বর্তমানের ক্ষমতার কাঠামোটিকে গিলে ফেলবে। কারণ, সাভেজের মতে, যে কোন ধরনের রাষ্ট্রের ধর্মই হল বিপ্লবকে বাধা দেওয়া। তাই প্রয়োজন পুরনো রাষ্ট্রটিকে বিপ্লবী রাষ্ট্রে পরিণত করা।

সংবিধানের সংস্কার প্রসঙ্গে গণভোট

২০০৭ সালের ১৫ আগস্ট সাভেজ সংবিধানের সংস্কারের কথা বলেন। জাতীয় সভার অনুমোদনের পর তা দাঁড়ায় ৬৯ দফা সংস্কার, যার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রপতিত্বের ঊর্ধসীমা (২ বার) বাতিল, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বশাসনে (যা নয়া-উদারনৈতিকদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে) লাগাম পরানো, রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণের অধিকার বাড়ানো, আন্তর্জাতিক রিজার্ভের ওপর পাবলিক নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো, কমিউনাল কাউন্সিলগুলিকে আরও শক্তিশালী করা, সাপ্তাহিক কর্মসময় কমিয়ে ৪৪ ঘন্টার বদলে ৩৫ ঘন্টা করা প্রভৃতি। এই ৬৯ দফা সংস্কার দুটি ব্যালটে ভাগ করে দেওয়া হয়। ২ ডিসেম্বরের গণভোটে 'না' বিজয়ী হয় ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে। 'হ্যাঁ' পায় ৪৯ শতাংশ ভোট। এই ভোটে সাভেজের সমর্থক ভোটারদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ, ভোট দেননি। ফলপ্রকাশের পর তৎক্ষণাৎ সাভেজ 'এখনকার মত' হার স্বীকার করে নেন।

সাভেজের মতাদর্শ

ভেনেজুয়েলার এই পরিবর্তনের ব্যাপারটিকে বলা হচ্ছে বলিভারিয়ান বিপ্লব। এর আদর্শে কোন কোন দার্শনিকের প্রভাব আছে প্রশ্ন করাতে সাভেজ একবার এক তালিকা পেশ করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল নোয়াম চমস্কির নাম। ২০০৫ সালে এক বক্তৃতায় সাভেজ জোরের সঙ্গে বলেন, নাজারেথ-এর যিশু একজন সামাজিক ন্যায়ের প্রবক্তা এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। সাভেজ বারবার বলেন, যিশু এক সামাজিক সত্ত্বা, এবং ব্যক্তি — এই দুই হিসেবেই তিনি শ্রেণী সংগ্রাম, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়ের যোদ্ধা। যদিও সাইমন বলিভার কতটা সমাজতান্ত্রিক ছিলেন তা প্রশ্নাতীত নয়। নথিপত্র থেকে জানা যায়, বলিভার আমেরিকান বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন এবং ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি মুক্ত বাজার অর্থনীতির সমর্থক ছিলেন বলে শোনা যায়। শোনা যায়, তিনি যখন বলিভারিয়ান সংবিধান লেখেন, তখন তার সাথে থাকত মন্তেস্কু-র স্পিরিট অফ ল এবং অ্যাডাম স্মিথের ওয়েলথ অফ নেশনস। তিনি একই সঙ্গে আমেরিকান বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন, আবার

মুক্ত মানুষের পক্ষে থাকার দরুনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং হয়ত পুঁজিবাদের নতুন যাত্রার প্রতি সন্দেহপরায়ণও ছিলেন। তা ফুটে বেরোয় তাঁর এক বিখ্যাত উক্তিতে : "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিয়তি মনে হয় স্বাধীনতার নাম করে গোটা লাতিন আমেরিকায় দুর্দশা ডেকে আনা।"

সাভেজের মতাদর্শ কোন স্থিতিশীল ব্যাপার নয়। তিনিও শিখছেন অতীত এবং বর্তমানের দার্শনিকদের থেকে। ২০০২ সালের সামরিক ক্যুদেতাকে প্রকাশ্যে সমর্থন এবং গোপনে ব্যবস্থাপনায় সাহায্য প্রদানকারী আরসিটিভি-র লাইসেন্স নবীকরণ না করার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে পরে ২০০৭-এর একটি সমাবেশে সাভেজ ইতালিয়ান মার্ক্সবাদী আন্তোনীয় গ্রামসির রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিক সমাজের সম্মতির তত্ত্বের উল্লেখ করেন। কথিত আছে তাঁর কমিউনাল কাউন্সিলে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল ইৎভান মেজারোসের ১৯৯৫ সালে লেখা বই Beyond Capital। সমবায়িক উৎপাদন, শ্রমিকদের উৎপাদন পরিচালন আর সামাজিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিকল্পনা — এই তাঁর 'একুশ শতকের সমাজতন্ত্র'-র ভিত্তি। আবার সাপ্তাহিক টিভি সম্প্রচারে তাঁকে Empire-এর লেখক আন্তোনিও নেগ্রি ও মাইকেল হার্টের অনুসরণে বলতে শোনা গেছে 'মালটিচুড' বা প্রতিস্পর্ধী জনতার কথা। এবং সাভেজ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের বা অর্থনীতির যে কথা ১৯৯৯ সাল থেকে বলে আসছেন, তার তাত্ত্বিক বিকাশের অনেকটাই ঘটেছে মার্কিন অ্যানার্কিস্ট তাত্ত্বিক এবং আন্দোলনের কর্মী, ZNet-এর প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল অ্যালবার্টের হাত ধরে।

২০০৫ সালের ১৩ আগস্ট নিকোলাস মাদুরো, জাতীয় সভার সভাপতি, জোর দিয়ে বললেন, সমাজতন্ত্রই একমাত্র লক্ষ্য। সেদিনই সন্ধ্যেয় সাভেজও তাই বললেন, রোজা লুক্সেমবুর্গের কথা তুলে, 'সমাজতন্ত্র বা বর্বরতা'। ২০০৬-০৭ থেকে সাভেজ 'একুশ শতকের সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা বারবার বলতে শুরু করেন। ২০০৭ সালে পুনর্নির্বাচিত হবার পর সাভেজ নিজের দল MVR-কে ভেঙে দিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ভেনেজুয়েলান সমাজতান্ত্রিক পার্টি সংগঠন তৈরির কথা বলেন, যা তৃণমূল স্তর থেকে গড়ে উঠবে সমাজের স্বাভাবিক নেতাদের নিয়ে। এই পার্টি তৈরির প্রক্রিয়া এখনও ভ্রূণ স্তরে আছে।

২০০৬ সালে রুমানিয়ান ঐতিহাসিক ভেরা জাভালা ভেনেজুয়েলায় সাভেজের নেতৃত্বে চলা প্রক্রিয়াকে আখ্যা দেন অনেকটা এভাবে : গত সাত বছরের বলিভারিয়ান আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠা হয়েছে একটি সমান্তরাল গণতন্ত্রের। যা মোদ্দায় পুঁজিবাদী রাজনৈতিকতার পাশাপাশি একটা পুনর্বন্টনকামী ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র। এই ধরনের সংস্কারের ফলে ধারণা ও চর্চার জগতে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু তা পূর্বতন রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

মতাদর্শের নির্মাণ

ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক প্রক্রিয়াটি কি বিশ্বজোড়া এক মতাদর্শ নির্মাণ-প্রক্রিয়ার অঙ্গ? ১৯৮৯ সালে কারাকাসের রাস্তায় যে জনবিদ্রোহ ফেটে পড়েছিল, তা ছিল দিশাহীন, নেতৃত্ববিহীন এবং কিছুটা এলোমেলো। পুরনো রাজনীতি এবং দলগুলির মধ্যেও তখন এক ধরনের দিশাহীনতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সাভেজ এবং নতুন প্রজন্মের সমাজকর্মীদের মধ্যে বাস্তব আন্দোলনের এক নতুন প্রেক্ষিত খোঁজার চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৮২-তে MBR 200 থেকে ১৯৯৭-এ MVR হয়ে ২০০৭-এ ভেনেজুয়েলান সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠনের বিষয় নজরে এসেছে, কিন্তু আমাদের নজরে ধরা পড়েনি এরকম প্রক্রিয়াও নিশ্চয় রয়েছে সেখানে।

এই প্রক্রিয়ায় একটি উপাদান আমরা দেখেছি দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেমের আবার এক লাতিন আমেরিকান ঐতিহ্য ও ধরন রয়েছে। সেদিক থেকে আমরা পেয়েছি বলিভারিয়ান বিপ্লবের কথা। সাভেজের মতে, এটা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব যার প্রাণপুরুষ সাইমন বলিভার (১৭৮৩-১৮৩০)। এছাড়া সাভেজ আরও দুজনের নাম করেন, সাইমন রদ্রিগেজ (১৭৬৯-১৮৫২) এবং এজেকুয়েল জামোরা (১৮১৭-১৮৬০)। প্রসঙ্গত, সাইমন বলিভার তাঁর নিজের জীবনে ১,২৩,০০০ কিমি ভ্রমণ করেছিলেন, যা কলোম্বাস এবং ভাস্কো দা গামার মিলিত ভ্রমণের থেকে বেশি। তিনি ছ'টা দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন — বলিভিয়া, কলম্বিয়া, পেরু, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, পানামা। সাভেজ যখন এক লাতিন আমেরিকান ঐক্যের পটভূমিতে দেশগড়ার স্বপ্ন রচনা করেন, তখন এই তিন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রকল্পে ঐতিহ্যের সূত্রকে ধরে রাখে।

কিন্তু চিন্তার আন্দোলন ও প্রেক্ষিত গঠন সেখানেই থেমে থাকে না। কারণ পুঁজির নয়া উদারনৈতিক দৌরাত্মের প্রতিক্রিয়ায় লাতিন আমেরিকা জুড়েই ওই সময় শুরু হয়েছিল এক নতুন স্বাধীনতা আন্দোলন। রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র-বহির্ভূত, দুই পরিসরেই এই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে : ২০০৫ সালে 'সমাজতন্ত্রের আন্দোলন'-এর পক্ষে ইভো মোরালেস-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন; ভেনেজুয়েলা, কিউবা এবং বলিভিয়ার জোট 'বলিভারিয়ান অল্টারনেটিভ ফর লাতিন আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ক্যারিবিয়ান' (ALBA) গঠন; ২০০৬ সালে রাফায়েল করিয়া ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচন, যিনি সাভেজ মোরালেস ও কাস্ত্রোর সঙ্গে একত্রে 'একুশ শতকের সমাজতন্ত্র'-এর প্রবক্তা; ২০০৬ সালে সান্দিনিস্তা-র নেতা ড্যানিয়েল ওর্টেগা-র নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন; ওয়াক্সাকা ও সিয়াপা অঞ্চলের জনআন্দোলন সহ মেক্সিকোর সামাজিক ও নির্বাচনী আন্দোলন; ব্রাজিলের ভূমিহীন শ্রমজীবীদের আন্দোলন; আর্জেন্টিনার ফ্যাকট্রি দখল ও পরিচালনার আন্দোলন; কলম্বিয়ার বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরোধ; আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধের পরিস্থিতিতে কিউবার স্বনির্ভরতার আন্দোলন।

এই নতুন প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরনো রাজনীতি ও মতাদর্শের ছাপ রয়েছে, আবার এক নতুন সংশ্লেষও যেন ঘটে চলেছে। সেই সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে বুঝে ওঠার জন্যই এই বর্ণনা 'বিকল্পের ভেনেজুয়েলা'। 'বিকল্প' শব্দটাকে প্রশ্ন, সন্দেহ এবং সন্দেহের নিরসন — সমস্ত দিক থেকেই বিচার করা প্রয়োজন।

সূত্র :

১. উইকিপিডিয়ার বিভিন্ন প্রবন্ধ।
২. ভেনেজুয়েলা অ্যানালিসিস ডট কম-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ।
৩. জেড নেট-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ।
৪. মান্থলী রিভিউ-এর বিভিন্ন সংখ্যা।
৫. স্প্যানিশ কন্‌কোয়েস্ট ইন আমেরিকা, আর্থার হেল্পস্, ১৮৬১।
৬. কাউন্টারপাঞ্চ-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ।
৭. গ্রীন লেফট্ উইকলির বিভিন্ন প্রবন্ধ।
৮. দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ্ ইকোনমিক লিবারালাইজেশন ইন ভেনেজুয়েলা, জোনাথন দিজোন, ২০০৪।

সংযোজনী ১

একনজরে ভেনেজুয়েলা

বর্তমানে ভেনেজুয়েলার ২ কোটি ৭৭ লক্ষ (জানুয়ারি ২০০৭-এর আনুমানিক হিসেব) অধিবাসীর মধ্যে আমেরিকান ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপিয়ানদের মিশ্র ৬০ শতাংশ। ২৯% ইউরোপিয়ান, ৮% আফ্রো-আমেরিকান, এবং ২% এশিয়ান। মাত্র ১% মানুষ আমেরিকান ইন্ডিয়ান। প্রায় ৮৫% মানুষ শহরবাসী, ৯৬% মানুষ ক্যাথলিক ক্রিশ্চান।

স্পেনীয় আগ্রাসনের আগে পর্যন্ত এখানকার মানুষদের প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস এবং সংলগ্ন শিল্প। মূলত কফি এবং কোকো চাষ ছিল এখানে। স্পেনীয় আগ্রাসনের সময় থেকেই কোকো চাষ উঠে যেতে থাকে। এখন আবার কোকো চাষে এবং সংলগ্ন শিল্পে পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। ১৯৬০-৭০ সালে খনিজ তেলের উল্লম্ফন হবার পর থেকে কফি চাষেও মন্দা আসে।

কৃষি, জিডিপির ৫%। মোট শ্রমশক্তির ১০% এতে নিয়োজিত এবং ভেনেজুয়েলার ২৫% জমি কৃষিকাজে ব্যয়িত হয়। কিন্তু কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও ভেনেজুয়েলা চাল, সিগারেট, কফি, কোকো প্রভৃতি রপ্তানি করে। তথাপি তাকে গম প্রভৃতি খাদ্য কিনতে হয়। এই আমদানির ৩৩% আমেরিকার কাছ থেকে।

মোট শ্রমশক্তির ১৫% সরকারি চাকরি করে। ১৮% শ্রমিক ইউনিয়নভুক্ত। ৫৩% শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্র (Informal Sector)-এ কাজ করে। ভেনেজুয়েলার মোট বিদ্যুতের ৭৫% জলবিদ্যুৎ, এবং ২৫% তাপবিদ্যুৎ।

সংযোজনী ২

নতুন সংবিধানের কয়েকটি দিক

এই সংবিধানের আইনি ও রাজনৈতিক বাচনগুলোর আইডিয়া বিভিন্ন সূত্র থেকে নেওয়া, যার মধ্যে পড়ে সাইমন বলিভারের সাংবিধানিকতা এবং জন সার্বভৌমত্ব (popular sovereignty), পেরুর মার্ক্সবাদী হোসে কার্লোস মারিয়াতেগুই, হোসে মার্তি ও এভেনি পাঙ্কানিস-এর দার্শনিক ছাপ। এটা একটা বলিভারীয়-মার্কসীয় লিপি। যার মধ্যে আছে, জন সার্বভৌমত্ব (ঘন ঘন গণভোট), সামাজিক দায়বদ্ধতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার, এবং বিদেশি দমনের বিরুদ্ধে সার্বিক স্বাধীনতা।

● নতুন সংবিধান অনুযায়ী দেশটার নাম হয় 'বলিভারিয়ান রিপাবলিক অব ভেনেজুয়েলা', অনেকটা সাভেজের চাপাচাপিতেই। সংবিধান অনুযায়ী এই রাষ্ট্রের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল জীবন, স্বাধীনতা, ন্যায়, সমতা, সহযোগিতা, গণতন্ত্র, সামাজিক দায়বদ্ধতা, মানবাধিকার, নৈতিকতা, এবং রাজনৈতিক বহুত্ববাদ।

● সংবিধানে মূল আটটি শিরোনাম আছে। পরপর সেগুলি হল : মূল নীতি; ভৌগোলিক পরিসর ও রাজনৈতিক ভাগ; কর্তব্য, মানবাধিকার এবং তার নিশ্চিতকরণ; জনক্ষমতা; সাংবিধানিক সংস্কার; জাতীয় গণ কর্তৃত্বের সংগঠন; সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; জাতীয় নিরাপত্তা; সংবিধানের সুরক্ষা।

● চিরাচরিত সাংবিধানিক গণতন্ত্রে সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তিনটি স্তম্ভ থাকে। ভেনেজুয়েলার সংবিধানে পাঁচটি স্তম্ভ বা শাখার কথা বলা আছে। কার্যকরী শাখা (রাষ্ট্রপতিত্ব), আইনি শাখা (জাতীয় সভা), বিচার শাখা (বিচারব্যবস্থা), নির্বাচনী শাখা (নির্বাচনী ক্ষমতা), এবং নাগরিক শাখা (নাগরিক ক্ষমতা)।

● নতুন দুটি শাখার মধ্যে 'জাতীয় নির্বাচনী কাউন্সিল'-এর নেতৃত্বে রয়েছে নির্বাচনী শাখা। সমস্ত ধরনের নির্বাচন প্রক্রিয়া ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা স্বাধীনভাবে দেখা হল তার দায়িত্ব।

নাগরিক শাখাটির নেতৃত্বে রয়েছে 'রিপাবলিকান এথিকস্ কাউন্সিল'। ভেনেজুয়েলান রাষ্ট্রের হাত থেকে জনগণের রক্ষা এবং প্রতিনিধিত্বের দায় এর। তাছাড়া নৈতিকতা এবং মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি কার্যকলাপের বিচারের দায় এর। রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সভা এবং সংবিধানের কার্যকলাপ নীতিবিরুদ্ধ হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এর কাজ। তবে এই দুই শাখার সদস্য মনোনয়ন এবং বিতাড়ন অনেকটাই জাতীয় সভা এবং বিচার শাখার হাতে রয়েছে।

● বিচার শাখার শীর্ষে আছে 'সুপ্রিম ট্রাইবুনাল অফ্ জাস্টিস'। কৃষি, শ্রম এবং শিশুদের ব্যাপার সামাজিক বিচার বিভাগের অন্তর্গত। বিচারকরা সবাই গণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত।

● এই সংবিধানের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে (জাতীয় সভার সদস্য, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি) জনগণের ফিরিয়ে নেবার অধিকার। ভেনেজুয়েলান ভোটাররা যদি মোট সংশ্লিষ্ট ভোটার সংখ্যার ২০ শতাংশের সই জোগাড় করতে পারে, তাহলে জনপ্রতিনিধিকে ফিরিয়ে নেবার জন্য গণভোট হবে। ২০০৪ সালে রাষ্ট্রপতি সাভেজকে ফিরিয়ে নেবার জন্য এরকম একটি গণভোট হয়। সাভেজ তাতে বিপুল ভোটে জয়ী হন।

● রাষ্ট্রপতিত্বের সময়সীমা ৬ বছর। এবং পরপর ২ বারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না। রাষ্ট্রপতি কিছু কিছু অবস্থায় জাতীয় সভা ভেঙে দিতে পারেন। পূর্বতন সংবিধানের তুলনায় এই সংবিধানে জাতীয় সভার ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিস্তরীয় জাতীয় সভার বদলে একস্তরীয় করা হয়েছে তাকে।

● রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক দুর্যোগ এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তাজনিত কারণে সাময়িকভাবে সংবিধানের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে, তবে তা আইনি সভার স্বীকৃতিসাপেক্ষ এবং কোনভাবেই তা জীবনের অধিকার হরণ, কারণ না জানিয়ে গ্রেপ্তার বা অত্যাচার, তথ্যের অধিকার হরণ এবং সামগ্রিক মানবাধিকার হরণ করে নয়। এবং এই ব্যতিক্রমের সময় জনক্ষমতার কার্যকলাপ থেমে থাকবে না।

● জল সরবরাহ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। খনিজ সম্পদের অধিকার এবং সরবরাহ রাষ্ট্রায়ত্ত, তবে এর উত্তোলন, শোধনের জন্য দেশি-বিদেশি বেসরকারি পুঁজি-প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হতে পারে। গ্রাম্য অর্থনীতি, শিল্প নয় এমন মৎস্য-জীবিকা, কুটিরশিল্প, ভেনেজুয়েলার গ্রাম্য সংস্কৃতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। শিক্ষা এবং কাজ হল মৌলিক সামাজিক অধিকার এবং কর্তব্য।

● এই সংবিধানের আরেকটি বড়ো দিক হল গণভোট। রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে, বা জাতীয় সভার উদ্যোগে বা ১০ শতাংশ ভোটারের উদ্যোগে জরুরি কোন জাতীয় বিষয়ে গণভোট হতে পারে। তবে একই বিষয়ে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে দ্বিতীয়বার গণভোট করা যাবে না।

● স্বাস্থ্যকে মৌলিক সামাজিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই সংবিধানে। গণস্বাস্থ্যের অর্থকরী দিকটি রাষ্ট্রের দায় এবং যে কোন অবস্থাতেই এর সম্পদ বা কার্যকলাপের বেসরকারিকরণ করা যাবে না। অপরপক্ষে সংগঠিত কৌমের অধিকার ও কর্তব্য হল গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থার নীতিনির্ধারণে, লাগু করায় ও নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণমূলক। শিক্ষা এবং কাজের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে।

এই সংবিধান একটি ছোটো বই আকারে বাজারে বিক্রি হয় ভেনেজুয়েলায়। সংবিধানটি জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব নাগরিক শাখার।

সংযোজনী ৩

কমিউনাল কাউন্সিল বিশেষ আইন

কমিউনাল কাউন্সিলের বিশেষ আইনটি ঘোষিত হয় ২০০৬ সালের ৯ এপ্রিল সরকারি টিভিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সাভেজের টক্ শো 'আলো প্রেসিদন্ত'-এ। আইনটি নিম্নরূপ :

প্রথম পরিচ্ছদ : সাধারণ বিষয়

নীতিমালা

ধারা ১. অংশগ্রহণমূলক এবং প্রোটাগনিস্ট গণতন্ত্রের পরিকাঠামোতে কমিউনাল কাউন্সিল হল সেই উপকরণ যার সাহায্যে সংগঠিত জনগণ সদর্থক (fair) এবং ন্যায্য সমাজ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিউনিটির প্রয়োজনীয় এবং আকাঙ্খিত পরিকল্পনা ও নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করার প্রশাসনিক কাজকে সরাসরি অধিগ্রহণ করতে পারে। কমিউনাল কাউন্সিলের সংগঠন ও কার্যকলাপ সহ-দায়িত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সামাজিক দায়, সদর্থ, ন্যায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক স্ব-ব্যবস্থাপনার নীতিতে চলবে।

লক্ষ্য

ধারা ২. এই আইন কমিউনাল কাউন্সিলগুলির সংগঠন, সংহতি, সামঞ্জস্য ও কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনা, রূপায়ণ, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ণের জন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য।

সংজ্ঞা

ধারা ৩. সংজ্ঞাগতভাবে,

১. কমিউনাল কাউন্সিল হল জনগণের অংশগ্রহণ এবং মুখ্য ভূমিকা (protagonist) নেওয়ার একটি ব্যবস্থা; বিচিত্র কমিউনাল সংগঠনের, সামাজিক গোষ্ঠীর, এবং নাগরিকদের — যারা একটি কমিউনিটির কাঠামো এবং জীবনীশক্তি — তাদের সংহতি ও আদানপ্রদানের একটি রূপ।

২. একটি কমিউনিটি বা কৌম হল কতগুলি পরিবার বা নাগরিকের একটি সামাজিক সম্মিলন, যারা ভৌগোলিকভাবে একই জায়গায় বাস করে; যাদের সাধারণ ইতিহাস এবং স্বার্থ আছে; যারা পরস্পরকে চেনে এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত; যারা একই গণ-উপযোগিতা (public utility) ব্যবহার করে; যাদের সাধারণ প্রয়োজন একই ধরনের এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, শহর-পরিকল্পনা প্রভৃতিতে সদৃশ সম্ভাবনা।

৩. কমিউনিটির ভৌগোলিক বিস্তার এবং জনঘনত্ব : ভৌগোলিক অঞ্চল যাকে কমিউনিটিটি একটি নাগরিক সভায় ভৌগলিক সীমা বলে ঠিক করবে, এর মধ্যে এক বা একাধিক কমিউনিটি কাউন্সিল থাকবে। মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণের বিচারে, কমিউনাল কাউন্সিলের পরিকল্পনা এবং প্রশাসনের দিক থেকে, সমাজতত্ত্ব এবং কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে, কমিউনিটিগুলি কয়েকশ' পরিবার নিয়ে তৈরি, শহরাঞ্চলে ২০০-৪০০ পরিবার এবং গ্রামাঞ্চলে ২০টি পরিবার নিয়ে। ভৌগোলিক অঞ্চল এবং জনঘনত্বের চুলচেরা হিসাব করবে নাগরিকদের সম্মেলন (citizen's assembly), কমিউনিটিটির বিশেষত্ব পর্যালোচনা করে।

৪. নাগরিক সম্মেলন : নাগরিক সম্মেলন হল জনগণের ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ এবং মুখ্যতার প্রাথমিক পরিচয়, যার সিদ্ধান্ত কমিউনাল কাউন্সিল মানতে বাধ্য।

৫. প্রতিবেশী অঞ্চল : ছোট্ট ভৌগোলিক অঞ্চল, যেখানে কমিউনিটিগুলি স্বাভাবিকভাবে এবং ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণভাবে বিভাজিত হয়েছে।

৬. মুখপাত্র : নাগরিক সম্মেলন থেকে নির্বাচিত (chosen) ব্যক্তি, যে কমিউনাল কাউন্সিলের সমস্ত কার্যকলাপ কো-অর্ডিনেট করবে, এর সিদ্ধান্তগুলি প্রণয়ণ করবে, এবং প্রয়োজনে সিদ্ধান্তগুলি জানাবে।

কর্তব্য

ধারা ৪. যে নাগরিকরা কমিউনিটি কাউন্সিল গড়ে তুলবে, তাদের কর্তব্য হল : সামাজিক সহ-দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা, এবং রাষ্ট্র বা অন্য কোন আইনি পথে প্রাপ্ত টাকার স্বচ্ছ, সময়মত, এবং ফলপ্রসূ পরিচালনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ : কমিউনাল কাউন্সিলের সজ্জা এবং সংগঠন

সজ্জা

ধারা ৫. কমিউনাল কাউন্সিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দিয়ে তৈরি : ১. নাগরিক সম্মেলন, যা হল সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারি সংস্থা। ২. বেশ কয়েকটি কাজের কমিটি যাদের প্রত্যেকের মুখপাত্র থাকবে, যাদের নিয়ে গঠিত হবে কার্যনির্বাহী সমিতি। ৩. অর্থনৈতিক প্রশাসনিক একক, যা অর্থনৈতিক সংস্থা। ৪. সামাজিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যা নিয়ন্ত্রক সংস্থা রূপে কাজ করবে।

কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য সংখ্যা :

ধারা ৬. সমিতির আয়তনের ভিত্তিতে এবং কার্যনির্বাহী সমিতির কর্তব্যগুলি পালনের জন্য নাগরিক সম্মেলন মুখপাত্রের সংখ্যা স্থির করবে।

নাগরিক সম্মেলনের কাজ: নাগরিক সম্মেলন হল কমিউনাল কাউন্সিলের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা এবং ওই কমিউনিটির ১৫ বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি। নাগরিক সম্মেলনের কাজ নিম্নে বর্ণিত :

১. মুখপাত্র চয়ন এবং ফিরিয়ে নেওয়া। ২. কমিউনিটির মধ্যে সহাবস্থানের নিয়মাবলী অনুমোদন করা। ৩. কমিউনাল কাউন্সিলের আইন এবং সংগঠন অনুমোদন করা। ৪. কমিউনিটির উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করা। ৫. কমিউনাল কাউন্সিলে পেশ করা কমিউনিটি-বিষয়ক প্রজেক্ট অনুমোদন করা। ৬. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। ৭. কমিউনিটি জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ৮. অন্যান্য কমিউনিটির সাথে জড়িত প্রজেক্টগুলি এবং সরকারের পরিকল্পনা অনুমোদন করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সাধারণ সমস্যার সমাধানকল্পে। ৯. কমিউনাল কাউন্সিলগুলির একটি নেট ওয়ার্ক তৈরির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ১০. সামাজিক নিয়ন্ত্রক এককের সদস্য মনোনয়ন করা। ১১. অর্থনৈতিক প্রশাসনিক এককের সদস্য মনোনয়ন করা। ১২. কাউন্সিলের নির্দিষ্ট সময়ের অর্থনৈতিক পরিচালনার মূল্যায়ন এবং অনুমোদন করা।

কমিউনাল কাউন্সিলের সদস্যদের চয়ন এবং সময়সীমা

ধারা ৮. অর্থনৈতিক এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার সদস্য নির্বাচন হবে নাগরিক সম্মেলন থেকে সরাসরি গোপন ব্যালটে। তারা ২ বছর থাকবে এবং প্রয়োজনে আর একবার নির্বাচিত হতে পারে। এগুলি সব অবৈতনিক পদ।

নির্বাচনের যোগ্যতা

ধারা ৯. নির্বাচিত হতে গেলে একজনকে অবশ্যই ১. ওই কমিউনিটিতে থাকতে হবে। ২. বয়সসীমার মধ্যে হতে হবে। ৩. নৈতিক মান থাকতে হবে। ৪. কমিউনিটির কাজের জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকতে হবে। ৫. ঐক্যের মানসিকতা থাকতে হবে। ৬. টিমওয়ার্ক পারতে হবে। ৭. কমিউনিটির আদেশ মানতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আঞ্চলিক এবং বিভিন্ন কাজের কমিটি কর্তৃক মুখপাত্রের সংগঠন

ধারা ১০. ওয়ার্ক কমিটিগুলির মুখপাত্রের নির্বাচনের সময় মাথায় রাখতে হবে যে বিষয়গুলি, প্রথমত, প্রতিটি নেইবারহুড অঞ্চল থেকে যেন একজন করে মুখপাত্র থাকে, দ্বিতীয়ত, অন্তত নিম্নলিখিত ওয়ার্ক কমিটিগুলি থেকে যেন একটি করে মুখপত্র থাকে : স্বাস্থ্য কমিটি, শহরের জমি কমিটি, সামাজিক নিরাপত্তা কমিটি, গ্রামীণ জমি কমিটি, জন অর্থনীতি কমিটি, সংস্কৃতি কমিটি, সংহত নিরাপত্তা কমিটি, প্রায়োগিক জল বৈঠক, প্রায়োগিক শক্তি বৈঠক।

অর্থনৈতিক পরিচালন একক প্রসঙ্গে

ধারা ১১. অর্থনৈতিক পরিচালন এককগুলি হল মানুষকে সংগঠিত করার একটি পথ এবং তা নাগরিক সম্মেলন দ্বারা মনোনীত কমিউনিটি সভ্যদের দিয়ে তৈরি। এটি হল কমিউনিটি কাউন্সিলের ফাইনান্সিয়াল অঙ্গ, যার লক্ষ্য কমিউনিটি কাউন্সিলের টাকা বা অস্থাবর সম্পদকে (স্থানীয় ভাবে তৈরি হওয়া বা সরকারের দেওয়া বা অন্যভাবে পাওয়া) জমা করা (banking)।

সামাজিক নিয়ন্ত্রকের একক প্রসঙ্গে

ধারা ১২. অর্থনৈতিক পরিচালন এককগুলি হল মানুষকে সংগঠিত করার একটি পথ এবং তা নাগরিক সম্মেলন দ্বারা মনোনীত কমিউনিটি সভ্যদের দিয়ে তৈরি। এটির কাজ হল কমিউনাল কাউন্সিলের সম্পদের পরিচালনার ইন্সপেকশন, নিয়ন্ত্রণ, দেখাশোনা এবং জন প্রশাসনের খবরদারি।

তৃতীয় পরিচ্ছদ : কমিউনাল কাউন্সিলের সংবিধান

প্রোমোটিং কমিশনের সংগঠন

ধারা ১৩. নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে একটি প্রমোটিং কমিশন গঠিত হবে :

১. একটি প্রভিশনাল প্রমোটিং টিম তৈরি হবে কমিউনিটির মধ্যে থেকে, যারা এই উদ্যোগের ব্যাপারে সম্ভব হলে লিখিত রেকর্ড রাখবে। ২. এই প্রভিশনাল প্রমোটিং টিম একটি নাগরিক সম্মেলন তৈরি করবে। ৩. এই নাগরিক সম্মেলন কমিউনিটির ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে থেকে অন্তত পক্ষে ১০ শতাংশের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রমোটিং কমিশন মনোনয়ন করবে।

প্রমোটিং কমিশনের কর্তব্য প্রসঙ্গে

ধারা ১৪. প্রমোটিং কমিশনের মূল কাজ হল কমিউনাল অর্গানাইজেশন অ্যাসেম্বলি আহ্বান করা এবং সংগঠিত করা। সেখান থেকে নির্বাচিত হবে ওয়ার্ক কমিটিগুলি এবং তার মুখপাত্ররা, ফাইনান্সিয়াল পরিচালন এককের সদস্যরা, সামাজিক নিয়ন্ত্রকের সদস্যদের। কমিউনাল অর্গানাইজেশন অ্যাসেম্বলীর কোরাম হয়েছে ধরা হবে যদি ওই কমিউনিটির ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের অন্তত ২০ শতাংশ সেটাতে উপস্থিত হয়। এই অ্যাসেম্বলির রায়ই চূড়ান্ত।

এই কাজ করার জন্য প্রমোটিং কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করবে :

১. কমিউনিটির মধ্যে কমিউনাল কাউন্সিলের সুযোগ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যর কথা বিজ্ঞাপিত করবে। ২. কমিউনিটির ভৌগোলিক অঞ্চলের একটি মানচিত্র তৈরি করবে। ৩. কমিউনিটির ইতিহাস বিষয়ক তথ্যাদি জড়ো করবে। ৪. কমিউনিটির জনগণনার কাজ সংগঠিত করবে। ৫. নির্বাচনের ফল বিচার ও ঘোষণা করবে এবং মুখপাত্র প্রভৃতিদের শপথবাক্য পাঠ করাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছদ : কমিউনাল কাউন্সিলের নথিভুক্তিকরণ

নথিভুক্তি

ধারা ১৫. কমিউনাল কাউন্সিল নথিভুক্ত হবে প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশন অন পপুলার পাওয়ার-এ। এই রেজিস্ট্রেশন নথির একটি কপি লোকাল পাব্লিক প্ল্যানিং কাউন্সিলকে দিতে হবে, জাতীয় পাব্লিক প্ল্যানিং সিস্টেমে নথিভুক্ত হবার জন্য।

পঞ্চম পরিচ্ছদ : কমিউনাল কাউন্সিলের কার্যাবলী

কার্যনির্বাহী বডির কর্তব্য

ধারা ১৭. কমিউনাল কাউন্সিল তার কার্যনির্বাহী বডির মধ্যে দিয়ে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করবে : ১. নাগরিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণ করা। ২. কমিউনিটির সামাজিক সংগঠনগুলির সাথে চলা এবং কমিউনিটির সামগ্রিক আত্মরক্ষা এবং সামগ্রিক উন্নতির জন্য যেখানে যখন প্রয়োজন সংগঠন তৈরি করা। ৩. কমিউনিটি তার নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে সেগুলির জন্য কর্মপরিকল্পনা বানানো এবং তার ফলাফল পর্যালোচনা করা। ৪. প্রতিটি ওয়ার্ক কমিটিতে সামাজিক স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা। ৫. প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশন অফ পপুলার পাওয়ার-এ তাদের রেজিস্ট্রেশন করানো। ৬. অংশগ্রহণের বিষয়ে খতিয়ান তৈরি করা। ৭. তাদের নিজস্ব কানুনসমূহ তৈরি করা। ৮. সাংবিধানিক উদ্যোগকে তুলে ধরা।

ফিনান্সিয়াল (অর্থনৈতিক) বডির কর্তব্য

ধারা ১৮. ফিনান্সিয়াল (অর্থনৈতিক) বডির কর্তব্য :

১. নিজেকে কমিউনিটি মাইক্রোব্যাঙ্ক বা সঞ্চয় এবং ঋণের জন্য, ফিনান্সিয়াল বা নন-ফিনান্সিয়াল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভে পরিণত করা। ২. অর্জিত বা প্রাপ্ত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের নথি রাখা। ৩. এন্ডোজেনাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের জন্য সহযোগ্য সমবায় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা। ৪. অংশগ্রহণমূলক বাজেট তৈরি এবং সেই জন্য কমিউনিটির প্রয়োজন এবং তার সন্ধান করার উদ্যোগ গ্রহণ।

নিয়ন্ত্রণ বডির কর্তব্য

ধারা ১৯. নিয়ন্ত্রণ বডির কর্তব্য নিম্নলিখিত : ১. কমিউনাল কাউন্সিল এবং প্রশাসনের কার্যাবলীর দিনান্তে ফলো আপ করা। ২. কমিউনিটির নিয়ন্ত্রকের সমন্বয় তৈরি করা। ৩. কমিউনিটির উন্নতির পরিকল্পনাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি। ৪. কমিউনিটি প্রজেক্টগুলোর আলোচনা, পরিকল্পনা, উন্নয়ন, রূপায়ণ এবং ফলো আপ এর ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ : ফাইনান্সিয়াল সম্পদ প্রসঙ্গে

ধারা ২০. কমিউনাল কাউন্সিল নিম্নলিখিত ফিনান্সিয়াল সম্পদ সরাসরি পাবে : ১. যা তাদেরকে রিপাবলিক, রাজ্য, মিউনিসিপালিটি সরাসরি দিল। ২. যা গণ উপযোগিতা থেকে এল এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে এল কমিউনাল কাউন্সিলের হাতে। ৩. যা তাদের নিজেদের কার্যাবলী থেকে তৈরি হল, এর মধ্যে সম্পদের পরিচালনের মাধ্যমে আসা সম্পদও পড়বে। ৪. যে সম্পদ বর্তমান আইন কাঠামোতে অনুদান হিসেবে পাওয়া গেল। ৫. অন্য কোনো সংবিধান সম্মত প্রক্রিয়ায় ফাইনান্সিয়াল লাভের মধ্যে দিয়ে।

সপ্তম পরিচ্ছদ : কমিউনিটির নিজেদের সম্পদ-প্রশাসন

ধারা ২১. কমিউনাল কাউন্সিলের ফিনান্সিয়াল (অর্থনৈতিক) বডির কর্তব্য নিম্নলিখিত : ১. নিজেদের সম্পদের সুরক্ষা; ২. ঋণ দেওয়া; ৩. ব্যাঙ্কিং সার্ভিস করা; ৪. সামাজিক সহায়তা এবং ৫. ফান্ডের পরিচালন।

সম্পদের পরিচালন

ধারা ২২. ন্যাশনাল ফান্ড ফর পপুলার পাওয়ার থেকে আসা ফান্ডের পরিচালন প্রসঙ্গে নির্দেশিকা : ১.ফিনান্সিয়াল সম্পদের প্রশাসকেরা ফিনান্সিয়াল ব্যালান্সের নীতি মেনে চলবেন। ২. সম্পদের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সাধারণ সভাতে স্বীকৃত হতে হবে। ৩. এই সিদ্ধান্তগুলি একটি কাগজে লিখতে হবে যেখানে কমিউনাল কাউন্সিলের নাগরিক সম্মেলনের অধিকাংশের সই থাকতে হবে।

সম্পদ পরিচালনের সংগঠন

ধারা ২২. সম্পদের পরিচালনের জন্য কমিউনাল কাউন্সিল নমনীয়, উন্মুক্ত, গণতান্ত্রিক, যৌথ এবং অংশগ্রহণমূলক সংগঠন, যেমন মাইক্রোব্যাঙ্ক বা কমিউনিটি ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভ খুলবে।

ধারা ২৩. এই মাইক্রোব্যাঙ্ক বা ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভগুলি কো-অপারেটিভ সংস্থার বিশেষ আইন বা মাইক্রো-ফিনান্সিয়াল সিস্টেম তৈরি এবং উন্নয়ন-এর আইন মোতাবেক চলবে।

অষ্টম পরিচ্ছদ : কমিউনাল কাউন্সিলের জাতীয় ফান্ড

ধারা ২৪. কমিউনাল কাউন্সিলের জাতীয় ফান্ড তৈরি হল। এই ফান্ড ফিনান্স মন্ত্রকের সাথে যুক্ত থাকবে একজন প্রেসিডেন্ট এবং তিনজন মূল এবং আরো তিনজন পরিবর্ত সভ্যের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মাধ্যমে। এই বোর্ড অফ ডিরেক্টর মনোনয়ন করবে রাষ্ট্রপ্রধান।

ধারা ২৫. এই ফান্ডের লক্ষ্য কমিউনিটি, সামাজিক বা উৎপাদনমূলক প্রকল্পের জন্য

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশনের প্রস্তাবনা মোতাবেক অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। এই অর্থ যাবে কমিউনাল কাউন্সিলের ফিনান্সিয়াল পরিচালন এককের মাধ্যমে।

নবম পরিচ্ছেদ : পপুলার ক্ষমতার জন্য জাতীয় রাষ্ট্রপতি কমিশন

ধারা ২৬. পপুলার ক্ষমতার জন্য জাতীয় রাষ্ট্রপতি কমিশন এখানে তৈরি হল। এই কমিশন তৈরি হবে রাষ্ট্রপতির মনোনীত মন্ত্রী এবং কিছু উচ্চপর্যায়ের সরকারি অফিসারদের নিয়ে, যারা চীফ অফ স্টেট্স্-এর অনুরোধে আসবেন কমিশনে। এই কমিশনের মূল কাজ গড়ে ওঠা কমিউনাল কাউন্সিলগুলির জাতীয় স্তরে মূল্যায়ন, অংশগ্রহণমূলক এবং কুশীলবত্বের গণতন্ত্রের পরিকাঠামোর অধীনে পপুলার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা। কমিউনাল কাউন্সিলগুলির স্বীকৃত প্রকল্পগুলি রূপায়ণে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং এইসব প্রকল্প রূপায়ণের প্রাযুক্তিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সম্পদের বা রিসোর্সের ব্যবস্থা করা।

ধারা ২৭. এই জাতীয় কমিশন প্রতি রাজ্যের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে একটি করে আঞ্চলিক কমিশন তৈরির ব্যবস্থা করবে।

ধারা ২৮. এই জাতীয় কমিশন প্রতি মিউনিসিপালিটির জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে একটি করে স্থানীয় কমিশন তৈরির ব্যবস্থা করবে।

ধারা ২৯. জাতীয় পরিষদ একটি কমিশন তৈরি করবে, যা অন্যান্য প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশনগুলির সাথে মিলে কমিউনাল কাউন্সিলগুলির গঠন এবং তার আইনকানুনের ব্যাপারটি পর্যালোচনা করবে।

এই কমিশন প্রথম পর্যালোচনা রিপোর্ট তৈরি করবে এই আইন প্রণয়নের ৯০ দিনের মধ্যে, তারপর থেকে প্রতি ৯০ দিনে একটি করে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

ধারা ৩০. যে কোনও কমিউনাল কাউন্সিল, যা এই আইন প্রণয়নের আগে তৈরি হয়েছে, তাকে এই আইন প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে।

দশম পরিচ্ছেদ : অন্তিম বিষয়

যে কোনও পূর্বতন আইন যা এই আইনের পরিপন্থী তা আজ থেকে অকার্যকর হল।

একাদশ পরিচ্ছেদ : উত্ক্রমণমূলক বিষয়

এই আইন কার্যকর হবার ৯০ দিনের মধ্যে সাংবিধানিক বিষয়গুলি দেখবে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ।

আর একবার হিংসা-অহিংসার তর্ক

জিতেন নন্দী

উড়িষ্যার জগৎসিংহপুরে গত তিন বছর ধরে এক লাগাতার প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। দক্ষিণ কোরিয়ার পস্কো নামক কোম্পানি সেখানে এক বিশাল ইস্পাত শিল্প এবং নিজেদের প্রাইভেট বন্দর বানাতে চাইছে। সেখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে লোহা সমেত অন্যান্য আকরিক তুলে নিয়ে ওই কোম্পানি বিদেশে রপ্তানি করতে চাইছে। দিল্লির সরকারের মদত নিয়ে উড়িষ্যা সরকার পস্কোর সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছে। পস্কো দিল্লির কাছ থেকে SEZ–এর ছাড়পত্রও আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষ নিজেদের চাষ ও বসবাসের জমি ছাড়তে নারাজ। তাদের নানারকম প্রলোভন দেখানো হয়েছে। পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে হামলাও করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়নি। পস্কোর জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যে ৪০০৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আজ পর্যন্ত সেখানে জমি জরিপ করতে দেয়নি স্থানীয় প্রতিরোধকারী মানুষ।

গতবছর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমরা কয়েকজন ওখানে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ২৯ নভেম্বর পস্কো কোম্পানি, উড়িষ্যা সরকার এবং বিজেডি দল যৌথভাবে ওখানে এক বড়ো ধরনের হামলা চালিয়েছে। গ্রামে গ্রামে পুলিশ ও গুণ্ডাদের রাজত্ব চলছে। কিন্তু একটি গ্রাম, ধিনকিয়াতে 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র নেতৃত্বে গুণ্ডা ও সরকারি বাহিনী ঢুকতে পারেনি। সিপিআইয়ের রাজ্যনেতা অভয় সাহু নিজে সেখানে প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, ১৫ ডিসেম্বর আমরা জগৎসিংহপুর শহরে দেখতে পেলাম, কালেক্টরেট অফিসের সামনে গান্ধীজীর ছবি নিয়ে ভুখ হরতাল করছেন 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন' ও 'নব নির্মাণ সমিতি'র যুব-কর্মী বিশ্বজিত রায়। সেদিন তাঁর উপবাসের এগারোতম দিন চলছে।

আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম এখানে তিন বছর ধরে বেশ কিছু সংগঠন এই প্রতিরোধ-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এই আন্দোলনে চিন্তার দিক থেকে স্পষ্ট দুটি ধারার উপস্থিতি রয়েছে। একদিকে, সর্বোদয়পন্থী ধারা, যারা নিজেদের 'অহিংস' বলেই মনে করে। অন্য ধারাটি বলে, 'আমরা হিংসার পক্ষে নই। কিন্তু আত্মরক্ষার্থে যদি লাঠি, তীর ধনুক না ধরা হয়, তাহলে মানুষ আস্থা হারাবে।' সিপিআইয়ের নেতা অভয় সাহু প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি' এই ধারার পথিক।

ধিনকিয়া পঞ্চায়েতের মধ্যে ধিনকিয়া গ্রামের আগেই গোবিন্দপুর গ্রাম। সেখানে আমরা দেখলাম পুলিশ এবং ভাড়াটে গুণ্ডাদের উপস্থিতি রয়েছে। আমাদের বলা হল, 'আপনারা ধিনকিয়াতে যাবেন না। ওখানে মাওবাদীরা রয়েছে। ওদের সঙ্গে মারাত্মক সব অস্ত্র রয়েছে।' আমাদের যখন নিরস্ত করা গেল না, তখন আমাদের গাড়ির আগাপাস্তলা তল্লাশি করা হল। অথচ আমরা ধিনকিয়াতে গিয়ে পেলাম সেইসব পুরুষ ও মহিলাদের, যাঁরা ২৯ নভেম্বর পস্কো-সমর্থকদের হাতে ঘায়েল হয়ে পড়ে রয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁদের ছবি আমাদের সঙ্গে এখনও রয়েছে।

একটা তর্ক ওখানে রয়েছে। সর্বোদয়পন্থীরা বলছেন, পস্কোপন্থীদের আক্রমণের মুখে পড়ে যে আত্মরক্ষামূলক হিংসার পথ নিয়েছে 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি', তা পস্কোপন্থীদের পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। ওরা এর ফলে নিজেদের অপপ্রচার এবং হামলা চালিয়ে যাওয়ার কিছুটা সুযোগ নিয়েছে। এটা ঠিকই, মেধা পাটকার যেদিন ওখানে গিয়েছিলেন, সেদিন পস্কোপন্থীরা ঘোষণা করেছিল, মেধাজীর সঙ্গে যে কথা বলবে তাকে জরিমানা করা হবে। আমরা গিয়ে দেখেছি, বহু গ্রামবাসীকে মোটা টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। এধরনের সন্ত্রাসও অভূতপূর্ব।

সর্বোদয়পন্থীরা সন্ত্রাসের মুখে পড়েও পাল্টা সন্ত্রাস করেননি। এমনকি, গ্রামবাসীদেরও বারবার তাঁরা প্রতিশোধমূলক কিছু করার থেকে নিরস্ত করেছেন। ২৯ নভেম্বর এতবড়ো হামলার পর, ৪ ডিসেম্বর তাঁদের অনশনের ওপর গুণ্ডাবাজির পরও তাঁরা অহিংস-আন্দোলনের পথেই থেকেছেন। এমনকি, থানায় অভিযোগ দায়ের করা বা মামলা করার ব্যাপারেও তাঁদের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু তিনবছর ধরে এইসব যুব-কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধতা এতটুকু শিথিল হয়নি।

২

ওপরের বিবরণকে আমাদের তর্কের উপস্থাপনা হিসেবে ধরা যেতে পারে। একটা তর্ক আমাদের আন্দোলনের ইতিহাস জুড়েই ছিল : স্বাধীনতা

আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, এমনকি হালফিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের মধ্যেও রয়েছে হিংসা-অহিংসার পথের তর্ক।

আর একটা তর্কও রয়েছে এই তর্কের প্রায় কোল ঘেঁসে, উপায় এবং লক্ষ্যের প্রশ্নে : আমরা কি আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারি?

উড়িষ্যায় পস্কো-প্রতিরোধে শামিল সর্বোদয়পন্থী কর্মীরা হিংসার মধ্যেও স্তরভেদ করেছেন। তাঁরা বলছেন, হিংসার মধ্যেও আত্মরক্ষামূলক হিংসা (Defensive Violence) আন্দোলনের বেশি ক্ষতি করে। যদিও আগ বাড়িয়ে আক্রমণাত্মক হিংসার (Offensive Violence) পথও তাঁরা নেননি। কিন্তু একটা জিনিস তাঁদের উদ্যোগের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। যখন উড়িষ্যা সরকারের তরফে কুজঙ্গ-এর তহসিলদার ২৫ নভেম্বর ২০০৫ পস্কোর জমি অধিগ্রহণের প্রথম নোটিশ লাগালো নুয়াগাঁও গ্রামের রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের অফিস (RIO)-এ, তাঁরা RI অফিসে তালা লাগিয়ে দেওয়ার কথা বললেন। ২২ তারিখ গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে RI অফিসে তালা লাগিয়ে দিল। এই কর্মসূচীর মধ্যে হিংসা মোটেই ছিল না, কিন্তু ছিল একটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গী বা মেজাজ।

নন্দীগ্রামেও আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল এরকমই এক আক্রমণাত্মক মেজাজ নিয়ে — যখনই জানা গেল জমিগুলো দখল হয়ে যাবে কেমিকাল হাবের জন্য, এক লহমায় রাস্তা কেটে এলাকার দখল নিয়েছিল স্থানীয় মানুষ।

এখানে আমি আর এক আপাদমস্তক অহিংস আন্দোলনের প্রসঙ্গ আনব, আমাদের স্মৃতিতে এখনও তা মলিন হয়নি। মণিপুরের ১২ জন মায়ের সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সেনাবাহিনীর আস্তানা কাঙলা দুর্গের সামনে সমবেত গর্জন : '... এসো, আমাদের ধর্ষণ করো, হত্যা করো ... আমরা প্রত্যেকে মনোরমার মা।' আমরা সেই ছবিও তো দেখেছি, মায়েদের সেই মূর্তি দেখে কীভাবে দুর্গের লৌহকপাটের ভিতর ভয়ার্ত সৈন্যরা দূরে জড়োসড়ো হয়ে গেছে। আর সমস্ত উপত্যকা জুড়ে এক লহমায় ছড়িয়ে পড়েছে এক শক্তিশালী গণআন্দোলন। ২০০০ সাল থেকে ইরম শর্মিলার আমরণ অনশন অথবা ২০০৪-এর ১৫ আগস্ট পেবম চিত্তরঞ্জনের নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আত্মাহূতির মধ্যেও সেই দুঃসাহসী আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটা ছিল।

অহিংস আন্দোলনের আরও নজির আমরা পাই ইউরোপ-আমেরিকার সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে। দু-একটার উল্লেখ করব। ১৯৯৯ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার নৌবাহিনীর সেনা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কেনেথ নিকোলাস ও'কীফ। ২০০৩ সালে যখন আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করল, কেনেথ ও'কীফ ইউরোপে ঘুরে ৭৫ জনের এক দল নিয়ে গেলেন ইরাকে। যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেতু ও সড়কে আমেরিকা বোমাবর্ষণ করতে পারে, সেইসব জায়গায় তাঁরা 'মানব ঢাল' হিসেবে অবস্থান শুরু করেন। আর এক নজির পাই লন্ডনের যুদ্ধবিরোধী এক মিছিলে। আল কায়দার সহযোগী এক গোষ্ঠী নিক বার্গ নামে আমেরিকার এক যুবক কন্ট্রাক্ট শ্রমিককে ইরাকে আটক করে এবং তাঁর মাথা কেটে ফেলে। সেই দৃশ্য ভিডিও টেপের সাহায্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে দেখানো হয়। নিকের বাবা মাইকেল বার্গ লন্ডনে এসে শান্তি মিছিলে যোগ দেন এবং বিবিসির কাছে সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর ছেলের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য বুশ প্রশাসনকেই দায়ী করেন। কেনেথ ও'কীফ বা মাইকেল বার্গের মধ্যে আমরা দেখলাম এক বিশাল ধ্বংসাত্মক আগ্রাসী ক্ষমতার সামনে দাঁড়িয়ে এক দৃঢ় অবিচল ভঙ্গী এবং সক্রিয়তা।

৩

এইসব দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা কোন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের চিহ্ন দেখিনি, যেমনটা হামেশাই আমাদের চারপাশে চোখে পড়ে। রুটিনমাফিক মিছিল, মিটিং, আইন অমান্য, ডেপুটেশন, কনভেনশন, সম্মেলন ইত্যাদি কর্মসূচী আমাদের এখনকার নাগরিক অধিকার, ট্রেড-ইউনিয়ন তথা পার্টি আন্দোলনের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। আমরা যেন এটা জেনেই কর্মসূচীতে শামিল হই, দাবিটা আদায় হবে না কিংবা প্রতিরোধ করা যাবে না। তাই কর্মসূচীর মধ্যে ছেয়ে থাকে একধরনের সঙ্কল্পহীনতা।

এই নিষ্ক্রিয়তা ও সঙ্কল্পহীনতার শেকড়টা কোথায়? কই বরাবর তো আমাদের এইসব কর্মসূচী এতখানি অর্থহীনতায় ভুগত না? এইসব কর্মসূচী তো এককালে আমাদের নানান কনসেশন বা সুবিধা আদায়ের পন্থা ছিল। এইসব কর্মসূচীর মাধ্যমেও কিছু প্রতিকার পাওয়া যেত। এইসব ছোটো ছোটো সাফল্য পার্টি আন্দোলনেও প্রাণ সঞ্চার করত।

এই বিষয়টাকে একজন তাত্ত্বিক, ইৎভান মেজারোস এইভাবে উত্থাপন করেছেন[১] : "অতীতে চালু আত্মরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পুঁজির কাছ থেকে কেবল তাৎপর্যপূর্ণ আংশিক সুবিধা আদায় করাই সম্ভব ছিল না — বাস্তবে আধিপত্যকারী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তুলনামূলকভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে আজ তাদের শৃঙ্খল থেকেও বেশি কিছু হারাতে হচ্ছে — কিন্তু ওই সুবিধাগুলি ছিল পুঁজির স্ব-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত গতিরই প্রয়োজনীয় এবং ইতিবাচক উপাদান (যার অর্থ হল, অবশ্যই, পুঁজিকে এইসব সুবিধা দিতে এক পয়সাও খরচ করতে হয়নি)।"

তিনি লিখেছেন, পুঁজির কাঠামোগত সংকটের এই নতুন পর্যায়ে "আত্মরক্ষামূলক সুবিধা আদায় ক্রমাগত কঠিন এবং শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়েছে — অতীতের মডেলে — চালু আত্মরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে (এবং সেইমতো আগেকার অভিজ্ঞতায় পাওয়া সহমতের রাজনীতির অবসান, যা সঙ্গে নিয়ে এসেছে শ্রম বনাম আধিপত্যকারী পুঁজির শক্তিগুলির দৃশ্যত আরও আগ্রাসী ভঙ্গী)।"

এই আত্মরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি বলতে তিনি ট্রেড-ইউনিয়ন, পার্টি এবং পার্লামেন্টের উল্লেখ করেছেন। একসময় এই প্রতিষ্ঠানগুলি পুঁজির কাছ থেকে কেবল কিছু কনসেশনই আদায় করেনি, সোভিয়েত বিপ্লবও এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতেই এসেছিল। লেনিন রাশিয়ায় সেই বিপ্লবকে পুঁজির দুনিয়াজোড়া শৃঙ্খলের 'দুর্বলতম গ্রন্থি'-তে আঘাত হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। সোভিয়েতকেও পুঁজির দুনিয়াজোড়া আধিপত্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গীতেই এগোতে হল, নয়া অর্থনৈতিক নীতি বা NEP ছিল তারই প্রকাশ।

অর্থাৎ, এই আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গী কেবল একটা ভঙ্গী বা উপায়ই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এর অন্তর্বস্তু। বিপরীতে, আমরা জনপ্রতিরোধের আক্রমণাত্মক ভঙ্গীর যেসব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি, তা কি নিছকই এক ভঙ্গিমা মাত্র?

রাষ্ট্রীয় স্তরে দেখা যাক। টানা পাঁচবছর ধরে ইরাকে প্রতিদিন যে গণনিধন চলছে এবং তা অবলীলায় মানবতার সমস্ত যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে, এই ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন কি নিছকই ক্ষমতার এক প্রকাশভঙ্গী? নাকি

---

[১] **Beyond Capital বইয়ে, উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ লেখকের।**

সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজির আধিপত্যের এক বিশেষ অন্তর্বস্তু নাছোড়বান্দা আগ্রাসনের আকারে নিজেকে জাহির করে চলেছে?

৪

হালফিল SEZ–এর ক্ষেত্রে দেখা যাক। ২০০৫ সালে পার্লামেন্টের মাধ্যমে SEZ আইন অনুমোদন পেয়ে গেল। অথচ সেখানে যেসব দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল, বিভিন্ন রাজ্যে তারা মওকা মতো SEZ বিরোধী আন্দোলনের শরিক বনে গেল। SEZ আইন এমন এক আইনী/সাংবিধানিক ক্ষমতার আধার, যা দেশের সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখাতে সক্ষম। শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত প্রায় সমস্ত অধিকারকে নস্যাৎ করার ছাড়পত্র তার রয়েছে। শুরু হয়ে গেল দেশের মধ্যেই একধরনের উপনিবেশ স্থাপনের অভিযান। একবিংশ শতাব্দীর আনকোরা SEZ আইন উনবিংশ শতাব্দীর আর এক ঔপনিবেশিক আইন, জমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৮–কে সঙ্গী করে রাজ্যে রাজ্যে আগ্রাসী অভিযানে নেমে গেল। আর সেই অভিযানের সামনে এতদিনকার বামপন্থী দল, ট্রেড–ইউনিয়ন এবং পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র সামান্য ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই করতে পারল না। এই ঘটনাকে কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা ট্রেড–ইউনিয়নের ব্যর্থতা হিসেবে দেখতে চাইছে, তারা পরিত্রাণ খুঁজতে চাইছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে। কিন্তু এটা কি তামাম আত্মরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অকার্যকারিতাকেই তুলে ধরছে না?

এ মোটেই হতাশার কথা নয়, হতাশার অন্ধকারে আশার আলোর বিন্দুগুলিকে খুঁজতে চাওয়ার চেষ্টা মাত্র। ভারতবর্ষ জুড়ে এই আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে সমাজের ভিতর থেকে এক সদর্থক প্রতিরোধের চেষ্টা আমাদের চোখে পড়ছে। কলিঙ্গনগরে যখন টাটার জন্য জমি দখল করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষকে হত্যা করা হল, সিঙ্গুরে যখন টাটার জন্য জমি ঘিরে পাঁচিল তুলে দেওয়া হল, তখন নন্দীগ্রাম এলাকার দখল নিয়ে বলল : 'সিঙ্গুর পেয়েছ?' যখন নন্দীগ্রাম এবং পারাদীপে আগ্রাসী বহুজাতিক পুঁজির দম্ভ নিয়ে দল ও রাষ্ট্র বর্বর অভিযানে নামল, গোয়া অনুমোদিত SEZ-গুলিকে দিল্লির মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।[১] এসবই সম্ভব হল পুরনো আত্মরক্ষামূলক সংগঠনের ক্ষমতায় নয়, এক নতুন জনপ্রতিরোধের শক্তিতে।

এই জনপ্রতিরোধের শক্তির মধ্যে রয়েছে এক সক্রিয় আক্রমণাত্মক ভঙ্গী বা মেজাজ। 'আক্রমণাত্মক' শব্দটাকে আক্রমণ বা হিংসার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলে না। গুলিয়ে যারা ফেলছে, তারা আন্দোলনের গণচরিত্রকে বিপন্ন করে ফেলছে। এইসব জনপ্রতিরোধে হিংসাত্মক ঘটনা কিছুই ঘটেনি, তা নয়। ঘটেছে এবং ঘটতেই পারে। কিন্তু হিংসাকে যখন আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে; কিংবা সংগঠিত করা হচ্ছে, তখন তা এক আত্মরক্ষামূলক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। বিপদটা সেখানেই।

বিষয়টাকে আর একটু খোলসা করার জন্য আমি গান্ধীর বক্তব্যকে উদ্ধৃত করব : "অহিংসা 'দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে যাবতীয় বাস্তব লড়াই থেকে সরে থাকা নয়'। বিপরীতে, আমার অহিংসার ধারণা হল দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের থেকেও বেশি সক্রিয় এবং বেশি বাস্তব এক লড়াই। প্রত্যাঘাতের নিজস্ব প্রকৃতিই হল দুর্বৃত্তায়নকে বাড়িয়ে তোলা। আমার বিবেচনায় আমি মানসিকভাবে এবং সেই কারণে নৈতিকভাবে অনৈতিকতার বিরোধী। দস্যুর তরবারিকে আমি সম্পূর্ণরূপে ভোঁতা করে দিতে চাই। কিন্তু তা কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে নয়, বরং আমি দৈহিকভাবে প্রতিরোধ করতে পারি বলে তার যে প্রত্যাশা সেটাকেই আমি নিরাশ করে দিতে চাই। এর বিপরীতে হৃদয়ের যে প্রতিরোধ আমি করতে পারি সেটা তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে। প্রথমে এটা তাকে ধাঁধায় ফেলবে, শেষ পর্যন্ত তাকে এটা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করবে। এই স্বীকৃতি দানে কোন অপমান নেই, বরং এতে সে উন্নীত হবে।"[ইয়ং ইন্ডিয়া, ৮.১০.১৯২৫, বঙ্গানুবাদ লেখকের]

অবশ্য গান্ধী কী বলেছিলেন, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল কী কী ঘটেছিল বাস্তবের মাটিতে। ১৯৩০–এর লবণ সত্যাগ্রহের গণ–উদ্দীপনার কথা আজ সর্বজনবিদিত। ১৯৪২–এর আন্দোলনে মহিষাদলে এবং অন্যত্র রেললাইন উপড়ে ফেলা, সেতু ভেঙে দেওয়া, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বানচাল করার ঘটনাগুলির মধ্যেও একধরনের আক্রমণাত্মক মেজাজ ছিল। যদিও তা এক অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিমণ্ডলের মধ্যেই ঘটেছিল। সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে হিংসার ঘটনাও কিছু ছিল, কিন্তু তা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য উপায় হিসেবে আসেনি।

হিংসা–অহিংসার তর্ক এখনও চলবে। রাষ্ট্র সহ ক্ষমতার নানান প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হিংসা। আমাদের প্রবৃত্তির মধ্যেও তার বীজ রয়েছে। অহিংসা নির্ভর করে রয়েছে আমাদের স্ব–নিয়ন্ত্রণ এবং স্ব–পরিচালনার অভ্যাসের ওপর। আত্মরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বিপরীতে কী ধরনের সংগঠন আমরা সমাজে গড়ে তুলছি, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে এই হিংসা–অহিংসা তর্কের বাস্তব মীমাংসা।

১ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনআন্দোলনের চাপে গোয়ার প্রস্তাবিত ১৫টি SEZ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে রাজ্যের সরকার। এমনকি যে তিনটি অনুমোদিত SEZ–এর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিকেও ডি-নোটিফাই করতে রাজি হতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী দিগম্বর কামাত বলেছেন, "আমাদের অবস্থান হল, যদি গোয়ানরা SEZ না চায়, গোয়াতে SEZ আসবে না।" এই অবস্থান কি অন্য রাজ্যেরও নেওয়া উচিত নয়?

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হ'ন

এক বছরের ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক–চাঁদা পঞ্চাশ টাকা

মতামত, চিঠিপত্র, গ্রাহকভুক্তি এবং অন্যান্য যোগাযোগের জন্য
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, ডাকঘর : বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : jiten_nandi@vsnl.net

১. বিষয় : বিকল্প লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা

মাননীয় সম্পাদক
মন্থন সাময়িকী

এই চিঠির শিরোনাম হোক 'বল ভাই দাঁড়াই কোথা'? আমি আপনাদের এই ছোটো পত্রিকা (লিট্‌ল ম্যাগাজিন)-এর নিয়মিত পাঠক। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পরিসরে দৃষ্টিভঙ্গীকে বড়ো জায়গায় রেখে আপনারা কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছেন। আপনাদের প্রশংসা বা নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পত্রের অবতারণা করা হচ্ছে না। আমার একটা খটকা ও প্রশ্নের উত্তরের আশায় এই চিঠি।

এবারে 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজের ময়দানে ৩ থেকে ৫ জানুয়ারি ২০০৮ একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হল। আমি আমার এক বন্ধু মারফত খবর পেয়েছিলাম 'মন্থন সাময়িকী' এই মেলায় অংশগ্রহণ করছে না, কারণ এই মেলা বহুজাতিক সংস্থারা স্পনসর করছে। এবিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার দূরভাষে কথাও হয়েছে। কিন্তু আমার সংশয় দূর হয়নি। আমি সরেজমিনে বিষয়টি জানার জন্য ওই মেলায় যাই। বলতে দ্বিধা নেই, আমি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিন পড়ি। সুতরাং কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নয় — লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিভিন্ন লেখক, পাঠক, কর্মীরা স্ব-উদ্যোগে এধরনের একটি মেলা সংগঠিত করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার আশা ছিল আপনারাও এই মেলায় অংশগ্রহণ করবেন। এখানে পরিষ্কারভাবে বলে রাখা ভালো, এই মেলায় যারা অংশগ্রহণ করেনি তারা খুব ভুল করেছে বা সরকারি উদ্যোগে কোন মেলায় কেউ অংশগ্রহণ করলেই রে-রে করে ওঠার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আমার বয়স ৪৮ বছর। এই বয়সে বিনা বিতর্কে কোন কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না।

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় গ্রামের কৃষিজীবী ও প্রান্তিক সাধারণ গ্রাম্য মানুষজন একটি অচলায়তনে ঘা মেরেছে — তারা নির্বিচারে জমি অধিগ্রহণ করে তাদের ধ্বংস করে দেওয়ার বহুজাতিক চক্রান্ত (যার হাতিয়ার পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকার, ওড়িশায় নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি সরকার, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস সরকার, গুজরাত বা অন্য কোন রাজ্যে বিজেপি সরকার বা আঞ্চলিক দলের সরকার) বিনষ্ট করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। তার পরবর্তী ঘটনা প্রায় সকলের জানা। যে কোন আন্দোলনের জয় বা পরাজয় আছে। কিন্তু এই অঞ্চলের কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন আমাদের দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে লালিত আপোষমুখী মধ্যবিত্ত জরদ্‌গব মনকে নাড়া দিয়েছে। এবিষয়ে বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রতিবাদ করেছে। সম্ভবত তারই একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ'। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, যে কোন প্রতিষ্ঠান বেশিদিন গণতান্ত্রিক মতামতকে প্রাধান্য দেয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা ভাবতে গিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের কথা বাদ পড়ে যায়। ভবিষ্যতে ভুল হলে তার দায় সংখ্যালঘিষ্ঠকে বহন করতে হয়, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠরা সেই ভুল স্বীকার করতে প্রায়শ চায় না। তাই আমার মতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে কাজ করুক, সংগঠিত একটি ছাতার তলায় নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন কোথায় অংশগ্রহণ করল বা না করল তাতে যায় আসে না। সেজন্য পূর্বেই বলেছি সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা আয়োজিত মেলায় কেউ অংশগ্রহণ করা বা না করাতে কিছু এসে যায় না। তার সিরিয়াস কাজটাই আসল কথা।

একজন পাঠক হিসেবে প্রেসিডেন্সিতে আয়োজিত মেলায় ঢুকতে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেলাম 'ভোডাফোন'-এর গেট দেখে। তারপর একটু দূরে 'লিটল ম্যাগাজিন মেলা' লেখা বোর্ড। মেলার অদূরে মাঠে একটি স্টেজ, লেখা আছে 'মিলু' (হয়ত ছাত্র ইউনিয়নের কোন ফেস্টিভাল হবে)। সেটা স্পনসর করেছে বিভিন্ন সংস্থা, যার অন্যতম অবশ্যই 'ভোডাফোন'। লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলাটা 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটি' চাঁদা তুলে করেছে। খরচ আনুমানিক ২৫-৩০ হাজার টাকা, শুধুমাত্র মাঠটা ছাত্র ইউনিয়ন দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৩৬টি পত্রিকা মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। স্বাভাবিকভাবে মনে হল, মন্থন এলে ভালোই হত। দৃষ্টিভঙ্গীটা নমনীয় করলেই ভালো হত। ট্রেনে ফিরতে ফিরতে এসব ভাবছিলাম।

দ্বিতীয়দিন যাইনি। শেষদিন অর্থাৎ শনিবার মেলায় গিয়েছিলাম। শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রতুল মুখোপাধ্যায় গান গাইছেন তাঁর অনণুকরণীয় ভঙ্গীতে। শ্রোতারা তাঁকে অনুরোধ করছেন আরও গান গাইতে। হঠাৎ একজন উদ্যোক্তা (সমন্বয় কমিটি না ছাত্র ইউনিয়নের জানা নেই) ওঁকে কিছু বললেন। প্রতুলবাবু বললেন, 'আমি গান গাইতে এসেছি, মারামারি করতে নয়।' পেছনে ছাত্র ফেস্টিভালের মঞ্চ থেকে জোরে গান শুরু হল, 'তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, ও মন জান না' এবং মাইকের ক্যাঁ-কোঁ আওয়াজ। যাক, কেউ একজন ওদেরকে ওটা বন্ধ করতে অনুরোধ করার পর প্রতুলবাবু তসলিমা নাসরিনকে অন্যায়ভাবে রাজ্য থেকে বিতাড়ন করার বিষয় সুন্দরভাবে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করলেন। কিন্তু সুন্দর গান শোনার পরেও সমগ্র মেলা এবং তার অনুষ্ঠান নিয়ে খচখচানি শুরু হল। পরে বুঝতে পারলাম ছাত্র ইউনিয়নের মঞ্চে ব্যান্ডের গান হবে — টাইম ওভার হয়ে যাচ্ছে — শর্তসাপেক্ষ এই অনুষ্ঠান শীঘ্র শেষ করতে হবে। সম্পূর্ণটাই আমার অনুমান।

এখন বলতে দ্বিধা নেই, আমার খটকা ভাঙার শুরু সেখান থেকেই। ক্রমানুসারে আমার পয়েন্টগুলো সাজালাম।

১. মূল অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা একটি ছাত্র ইউনিয়ন। তাদের উৎসবের নাম মিলু। তারা লিট্‌ল ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটিকে মাঠে মেলা করার অনুমতি দিয়েছে নিশ্চয়। ছাত্রদের অনুষ্ঠান স্পনসর করছে বহুজাতিক সংস্থা। সুতরাং প্রকারান্তরে লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলার একটা অংশও ওই বহুজাতিক সংস্থারা স্পনসর করেছে। আর একটি কথা। ছাত্র ইউনিয়ন নামক প্রতিষ্ঠানটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলার অঘোষিত নিয়ন্ত্রক। না হলে প্রতুলবাবুকে ওই ধরনের উক্তি করতে হবে কেন?

২. পরের বছর যদি কোন অন্য দলের ছাত্র ইউনিয়ন হয়, (ধরা যাক, সরকারি বামদলের রাজনীতিপুষ্ট ছাত্র ইউনিয়ন), তারা কি এই লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা করতে দেবে? সুতরাং সমন্বয় কমিটিকে এবিষয়েও দৃষ্টি দিতে হবে, স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার। নাকি এলিট কলেজের এলিটিস্ট ছাত্রছাত্রীদের সামনে জানান দেওয়া আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, তবে বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা স্পনসর্ড ওই মঞ্চে আমরা বক্তৃতা দেব

না বা গান গাইব না।

৩. ত্রিশ বছরে অনেক পেঁয়াজি দেখলাম। মূল শত্রু কে, তা চিনলাম না। যে সমস্ত বহুজাতিক সংস্থা প্রচুর মুনাফার লোভে লোকজনের জমিজিরেত, বাস্তু, সংস্কৃতি, এমনকী আত্মাও লুঠ করে নিচ্ছে তারা, না ওই সংস্থার হয়ে যারা দালালি করছে সেইসব রাজনৈতিক দলের সরকাররা? আসল শত্রু কারা? যদি উভয়েই শত্রু হয়, তাহলে বয়কট করতে হলে সরকারি বা বেসরকারি ওইসব সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত মেলা বয়কট করতে হবে। ভাবের ঘরে চুরি করে লাভ হবে না। এই বিষয়টি প্রাজ্ঞ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ব্যক্তিগণ নিশ্চয় আমার চেয়ে ভালো জানেন আশা করি।

৪. একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। ওই লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। একদম কোন নিরক্ষর বা স্বল্পসাক্ষর গ্রামে গেলেও সাধারণ মানুষজন বই কিনুক বা না কিনুক অন্তত গান শুনতে বা বক্তৃতা শুনতে আসতেন। এখানে সেটুকু দর্শক বা শ্রোতাও নেই (অন্তত আমি যে দু'দিন ছিলাম)। প্রেসিডেন্সি কলেজ নামের মোহ এই মেলা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কাজ করেনি তো — জানতে পারলে খুশি হতাম।

পরিশেষে, আপনাদের মতামত জানতে আগ্রহী থাকলাম। কোন ব্যক্তি লেখক, সম্পাদক, পাঠক বা লিট্‌ল ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটিকে নিন্দা করা এই চিঠির উদ্দেশ্য নয়। একটা স্বাস্থ্যকর আলোচনা উঠুক এটা চাই।

৬ জানুয়ারি ২০০৮ রাহুল মিত্র

ব্যারাকপুর

২. বিষয় : খেজুরির ঘরছাড়া

প্রিয় সম্পাদক

দ্বন্দ্বদীর্ণ এই বিশ্বে কোন পত্রিকাকে নিরপেক্ষ থাকতেই হবে — এর কোন মানে নেই। 'আনন্দবাজার' বা 'গণশক্তি' তো ঘোষিতভাবেই নিরপেক্ষ নয়। তবে, সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য বিতর্কের উপস্থাপনা কোন কোন পত্রিকা করেই থাকে। ফলে, দ্বন্দ্বাধীন উভয়পক্ষের বক্তব্যই সেখানে ছাপা হয়। যেমন হয়েছে 'মন্থন' পত্রিকার নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৭ সংখ্যায়। এখানে নন্দীগ্রাম সংক্রান্ত সিপিএম-বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতির সাথে সাথে সিপিএমের বুদ্ধিজীবী ও সাংসদদের বিবৃতিও ছাপা হয়েছে। 'মন্থন'-কে ধন্যবাদ।

তবে, খেজুরির বাস্তবতা ও অতিকথা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এমন ধারণা হওয়ার অবকাশ আছে যে ঘরপোড়ানো, খুন ও অন্যান্য সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম বুঝি খেজুরিতেই হয়েছে; নন্দীগ্রামের ঘরছাড়াদের ঘর ছাড়তে প্রলুব্ধ করা হয়েছে; ত্রাণশিবির ও শিবিরাশ্রিতদের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা হয়েছে অন্য মাত্রা দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ, মেনাজ হোসেনের কর্নেট, অনিন্দিতার দু'টি ছবি ও তাঁর হাত থেকে উপহার পাওয়া শিবিরাশ্রিত শিশুদের সংখ্যা, সিপিএমের ২৯ জনের মৃতের তালিকা — এসবই মায়া, মনের বা দেখার বিভ্রম। যা বাস্তব, যা সত্য, তা হল — এগারো মাস ধরে ঘরছাড়াদের ঘর ছাড়তে প্রলুব্ধ করা হয়েছে যাতে এগারো মাস পরে 'ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরার মরীয়া চেষ্টা'র আবরণে 'ভয়ংকর, হাড়হিম করা পুনর্দখল অভিযান' সংগঠিত করা যায়। এভাবে আভাসে ইঙ্গিতে সিপিএমের সংগঠন ক্ষমতা ও নির্মাণ ক্ষমতায় যে মাত্রা আরোপিত হয়েছে, তা কল্পনার সমস্ত সীমাকে ছাড়িয়ে যায়।

'মন্থন' পাঠক-নির্ভর ছোটো পত্রিকা, বিজ্ঞাপন-নির্ভর নয়। তাই, পাঠক-স্বার্থেই অনুরোধ করব খেজুরির বাস্তবতা ও অতিকথার পরে নন্দীগ্রামের বাস্তবতা ও অতিকথা নিয়ে আগামী কোন সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হোক। নন্দীগ্রাম বিষয়ক একটি অতিকথা নিয়ে আপনিই লিখেছেন যে, এই আন্দোলন SEZ–বিরোধী আন্দোলন নয়। কিন্তু আরও অতিকথা আছে। প্রচুর পরিমাণেই আছে। মন্থনের 'নন্দীগ্রাম' সংখ্যা, বাংলা স্টেট্‌সম্যানের মহাশ্বেতা দেবীর কলম, মেধা পাটেকরের ইন্টারনেট প্রতিবেদন, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের নির্মিত দৃশ্যাবলী ইত্যাদি সেই অতিকথার সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে।

দু'পা ধরে চিরে-ফেলা বা আছড়ে-মারা শিশুদের সংখ্যা, ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা, তালপাটি খালে ভাসিয়ে দেওয়া লাশের সংখ্যা, রাতারাতি জল পাল্টে দেওয়া জলাশয়ের সংখ্যার সাথে সাথে পোড়া পলিথিন পাইপের সংখ্যাও বাস্তবতা বা অতিকথার উপাদান হতে পারে। স্কুলগুলি কেমন চলেছিল, তা ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের কাছ থেকে জানা যেতে পারে। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম কেমন চলেছিল, বিডিও অফিস থেকে তার হদিস মিলতে পারে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ কেমন ছিল, সেটা শ্রী কানু সান্যালের কাছে জানা যেতেই পারে।

আর সিপিএম-বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের তো ছত্রে ছত্রে অতিকথার অলংকার। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই।

চমস্কিদের প্রথম বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা জেনেছি সরকার কথা দিয়েছে নন্দীগ্রাম অঞ্চলে কোন কেমিকাল হাব গড়া হবে না।"

প্রতিবাদী বিবৃতিতে বলা হল, "নন্দীগ্রামে 'কোন কেমিকাল হাব গড়া হবে না' এই কথা বরাবর বলে এসেছে বলে সিপিএমের যে দাবি, তার উল্লেখ বিবৃতিটিতে আছে। কিন্তু এই কথাটা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই বিভ্রান্তিমূলক" ইত্যাদি, বুঝুন ব্যাপারটা!!

আর সিপিএমের ক্যাডাররা "ধর্ষণের মতো পুরনো অস্ত্র প্রয়োগ সহ বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনার মধ্য দিয়ে কৃষকদের পিটিয়ে আত্মসমর্পণ করাচ্ছে ..." — সম্পাদক মশাই এর সাথে সহমত?

স্তালিনিয় ঔদ্ধত্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে — "জনগণ যা চায়, পার্টি তার থেকেও তা ভালো বোঝে"। আশ্চর্য!! যে পার্টি তা না বোঝে, সে তো জনগণের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। জনগণের মধ্য থেকেই পার্টি উঠে আসে। জনগণের প্রাগ্রসর চেতনার সম্মিলন ঘটে পার্টির মধ্যে। এর মধ্যে ঔদ্ধত্য কোথায়? আসলে স্তালিন বলতে যাঁরা ঔদ্ধত্য বোঝেন, তাঁরাই এই বিবৃতির স্বাক্ষরকারী। স্তালিন-বিরোধী বহু মহাপণ্ডিতের মতোই, এঁরাও সব শেকড়হীন মহীরুহ। বিভিন্ন পুরস্কারে খচিত এঁদের তকমা শুধু চোখই ধাঁধায়, পথ দেখায় না। দেখাচ্ছেও না, দেখাবেও না।

আরও আছে। সব লিখতে গেলে অতিকথার অতিকায় প্রদর্শনী হয়ে যাবে। ছোটো পত্রিকার ছোটো পরিসরের প্রতি সেটা সুবিচার হবে না বলেই বিরত থাকলাম।

যাই হোক, অতিকথারও পরের কথা থাকে। সেই পরের কথার বর্ণমালার নির্মাণ চলছে এখনকার নন্দীগ্রামে। কিছুদিন পর সেই নির্মাণকর্মের অতিকথা বা বাস্তবতা মন্থনের পাতায় ঠাঁই পেলে খুশি হব।

২৮ জানুয়ারি ২০০৮ দীপেন সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনগর, কলকাতা ১৮

কয়লা ও পরমাণু দূষণ-মুক্ত বিদ্যুৎ
আমেরিকার জন্য বিকল্প পরিকল্পনা

শমীক সরকার

Carbon-Free and Nuclear-Free : A Roadmap for US Energy Policy আগস্ট ২০০৭-এ প্রকাশিত অর্জুন মাকিজানি-র লেখা একটি বই। আদতে এটি বিকল্প বিদ্যুৎ ও শক্তি-সামর্থ্য অর্জনের এক প্রকল্প। 'নিউক্লিয়ার পলিসি রিসার্চ ইন্সটিট্যুট'-এর প্রেসিডেন্ট হেলেন ক্যালডিকট এবং 'লস অ্যাঞ্জেল্স বোর্ড অফ হারবার কমিশনার্স'-এর প্রেসিডেন্ট এস. ডেভিড ফ্রিম্যান-এর প্রত্যক্ষ মদতে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। ফ্রিম্যান একসময় টেনেসি ভ্যালি অথরিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে তিনি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের 'আমেরিকার শক্তি নীতি' প্রকল্পের প্রধান ছিলেন। এখন এঁরা সকলেই কার্বন ডাইঅক্সাইড (বা কয়লা) এবং পরমাণু দুষণ-মুক্ত বিদ্যুতের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছেন। প্রকল্পের মূল ভাবনা এখানে সংক্ষেপে পেশ করা হল।

পৃথিবীব্যাপী ত্রিমুখী শক্তি-সংকট শুরু হয়েছে সেই ১৯৭০-এর দশক থেকে। এখন তা চরমে। এই তিনটি হল :

১. আবহাওয়া সংকট — জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের কারণেই মূলত আবহাওয়া সংকট দেখা দিয়েছে। তা যদি চলতে থাকে তবে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, সমাজ ও বাস্তুতন্ত্রে ব্যাপক এবং অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনবে।

২. খনিজ তেলের সরবরাহে অনিশ্চয়তা — বিশ্বব্যাপী খনিজ তেলের ব্যবহার অতি দ্রুত বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং খনিজ তেল সরবরাহকারী অঞ্চলগুলিতে দ্বন্দ্বের ফলে তেলের দাম প্রচুর বেড়ে গেছে এবং তা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

৩. পরমাণু অস্ত্রের প্রসার — কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণের বিকল্প হিসেবে পরমাণু বিদ্যুতকে তুলে ধরার ফলে বাণিজ্যিকভাবে পরমাণু প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে, ফলে পরমাণু অস্ত্রের প্রসার রোধের প্রয়াসটি লঙ্ঘিত হচ্ছে।

প্রায় এক দশকের বিভাজিত মতামতের পরে ইদানীংকালে আমেরিকাসহ সারা বিশ্ব মেনে নিয়েছে, কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিষ্ক্রমণ ভীষণভাবে কমানো আশু প্রয়োজন। ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে দূষণকারী বলে মেনে নেওয়ার পর এবং আমেরিকান কংগ্রেসে এই বিষয়ক একগুচ্ছ বিল পেশ হবার ঘটনার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আমেরিকাও তা মেনে নিয়েছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার সুপারিশ করা হচ্ছে। আরও অনেক প্রয়োজন আছে। তাছাড়াও বেশ কিছু সমাধান প্রস্তাব, যেমন, বিকল্প হিসেবে পরমাণু বিদ্যুতের ব্যবহার বা খাদ্য শস্য থেকে ব্যাপক হারে জ্বালানি তেল তৈরির প্রস্তাব সারা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যাকে আরও জটিল করবে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন ইন্দোনেশিয়ান পাম তেল থেকে যদি জৈব-জ্বালানি তৈরি করা হয়, তবে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ আরও বাড়বে বই কমবে না।

আমরা এই সমীক্ষার মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে তার শক্তি ক্ষেত্রকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শূন্য করা অর্থনৈতিক এবং প্রক্রিয়াগতভাবে সম্ভব কিনা। কার্বন ডাইঅক্সাইড শূন্য বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে প্রায় সমস্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ বন্ধ করা এবং এখনই বাতাসে উপস্থিত (কিছুসময় পূর্বে নিষ্ক্রান্ত হওয়া) কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাস থেকে তাড়ানো। আমরা এই সমীক্ষায় মূলত তিনটে প্রশ্নকে ধরে এগিয়েছি :

১. নিরাপত্তা ও অন্যান্য দিক থেকে সমস্যার পরমাণু বিদ্যুৎ না ব্যবহার করে আমেরিকান শক্তিক্ষেত্রকে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ মুক্ত করা বাস্তবে সম্ভব?

২. অন্য দেশ থেকে কার্বন-ঋণ না করে কার্বন ডাইঅক্সাইড শূন্য অর্থনীতি কি সম্ভব ?

৩. ওপরের ঘটনাগুলি কি মানানসই খরচের মধ্যে ঘটানো সম্ভব?

আমরা সমীক্ষা থেকে দেখতে পাচ্ছি, আগামী ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমেরিকায় একটি কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত, কার্বন-ঋণ মুক্ত এবং পরমাণু বিদ্যুৎ মুক্ত শক্তি অর্থনীতি খুবই সম্ভব। অন্যভাবে বললে, চালু বা আশু প্রযুক্তিগত হাতিয়ারকে ব্যবহার করে আমেরিকার শক্তিক্ষেত্রের কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব। এবং তা করা সম্ভব মানানসই খরচে এবং বর্তমানের থেকে বেশি শক্তি-নিরাপত্তা অর্জন করেই। আমেরিকাতে মোট খনিজ তেল আমদানি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে দূর করে ফেলা সম্ভব। তিন ধরনের শক্তি-অনিশ্চয়তা — আবহাওয়াজনিত, সরবরাহ ও মূল্যজনিত এবং পরমাণু অস্ত্রের প্রসার সম্পর্কিত — সবকটিরই মোকাবিলা করা সম্ভব। একই সঙ্গে নাগরিক স্বাস্থ্যের, বিশেষত শহর এবং উচ্চ দূষণ কবলিত এলাকায়, উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

তবে তার জন্য চাই অভূতপূর্ব দূরদৃষ্টি, স্থানীয় স্তরে এবং জাতীয় স্তরে সমস্ত বিদ্যুৎক্ষেত্রগুলির মধ্যে সমন্বিত নীতি। যদিও স্থানীয় এবং জাতীয় স্তরে সঠিক অভিমুখে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তথাপি এগুলির সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য একটি পরিষ্কার, দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের প্রয়োজন। কিছু মধ্যবর্তী লক্ষ্যবিন্দু স্থির করা প্রয়োজন, যা দিয়ে মাপা যাবে, আমরা কতদূর এগোতে পারলাম।

একটি কার্বন ডাইঅক্সাইড শূন্য, পরমাণু শূন্য আমেরিকান বিদ্যুৎক্ষেত্র অর্জন করা সম্ভব, শুধু তা-ই নয়, তা পরিবেশ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরিও বটে। কীভাবে তা সম্ভব?

সমীক্ষা থেকে পাওয়া ধারণাগুলির সংক্ষিপ্তসার এবং তার একটি পথনির্দেশিকা নীচে দেওয়া আছে :

১. সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারকারীর ওপরে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ ২০৬০ সালের মধ্যে শূন্যে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে আইন প্রণয়ন করা হোক। দিনে দিনে আবহাওয়াগত, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে এই লক্ষ্যমাত্রা আরও আঁটোসাঁটো

হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা ২০০৭-এর কিছু আগে থেকে বহাল হোক যাতে এরই মধ্যে যারা নিজেরাই নিজেদের জন্য এই ধরনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, তারা উপকৃত হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ হ্রাস করতে পারার কারণে আমেরিকান সরকার যে ছাড় দেবে বা না পারার কারণে যে কর ধার্য করবে তা যেন আমেরিকার মধ্যেই প্রযোজ্য হয়। কোনমতেই এই ছাড়কে আন্তর্জাতিক ভাবে বিকিকিনি করা যাবে না। এর মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব, যা প্রায় ৩,০০০-৫,০০০ কোটি ডলার, প্রতি বছরে গবেষণা, প্রদর্শনী এবং শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সমাজের পুনর্বাসনের কাজে লাগবে।

২. জীবাশ্ম জ্বালানি বিদ্যুৎ এবং পরমাণু বিদ্যুতের ওপর থেকে সমস্ত ধরনের ছাড়, ভর্তুকি ও সরকারি গ্যারান্টি তুলে নেওয়া হোক।

৩. জৈব-জ্বালানির সমস্তটা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন পাম তেল থেকে বায়োডিজেল এবং কর্ন থেকে ইথানল তৈরি করা হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যা তৈরি হবে। তাই খাদ্যশস্য থেকে জৈব-জ্বালানি তৈরিতে ভর্তুকি বন্ধ করা হোক।

৪. কেন্দ্রীয় সৌর-তাপ বিদ্যুৎ এবং সংলগ্ন তাপ সঞ্চয়, বড়ো ও মাঝারি মাপের সৌর ফোটোভোল্টায়িক কোষ, তরল জ্বালানিতে অনু-শৈবাল ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেওয়া সহ প্রধান প্রধান প্রযুক্তি-প্রকরণগুলি হাতেকলমে শেখার জন্য ডেমোনস্ট্রেটিভ প্ল্যান্ট তৈরি করা হোক। প্রধান প্রধান সরবরাহ প্রযুক্তির প্রদর্শনী করা হোক।

৫. ফেডারেল স্তরে, রাজ্যস্তরে এবং স্থানীয় স্তরে উন্নততর প্রযুক্তি ক্রয় করার ক্ষমতা তৈরি করা হোক।

৬. নতুন চালু হওয়া কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে যদি কার্বন সঞ্চয়ের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেগুলিকে নিষিদ্ধ করা হোক।

৭. ফেডারেল স্তরে উচ্চতর দক্ষতার দাবি আইনসিদ্ধ হোক।

৮. রাজ্যস্তরে এবং স্থানীয় স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কড়া আইন করা হোক এবং তার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পুরস্কার থাকুক।

৯. গাড়িগুলির ক্ষেত্রে উচ্চতর দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্র গাড়িতে লাগানো ২০১৫ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করা হোক।

১০. ফেডারেল সরকারি বরাতের ক্ষেত্রে যারা আগে থেকেই কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ কমানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে তাদের পুরস্কৃত করার চেষ্টা করা হোক।

১১. কার্বন ডাই অক্সাইড নিষ্ক্রমণ দ্রুত নিশ্চিহ্ন করাতে সক্ষম এরকম প্রযুক্তির জন্য গবেষণা, বিকাশ এবং পাইলট প্ল্যান্ট তৈরি প্রভৃতি কর্মসূচী নেওয়া হোক। উদাহরণ, সরাসরি সৌর হাইড্রোজেন উৎপাদন (সালোকসংশ্লেষ, সালোক তড়িত-রাসায়নিক এবং অন্যান্য প্রকরণে), গরম শিলা থেকে ভূ-তাপ শক্তি, জৈববর্জ্য থেকে জ্বালানি গ্যাস তৈরির (কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা সহ) প্রযুক্তি।

১২. আমেরিকার পরিবেশ সুরক্ষা এজেন্সির বিজ্ঞান বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটির অধীনে একটি শক্তি এবং আবহাওয়া বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি তৈরি করা হোক।

২০৫০ সালে কয়লা এবং পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যতিরেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য বিদ্যুৎ জাল।

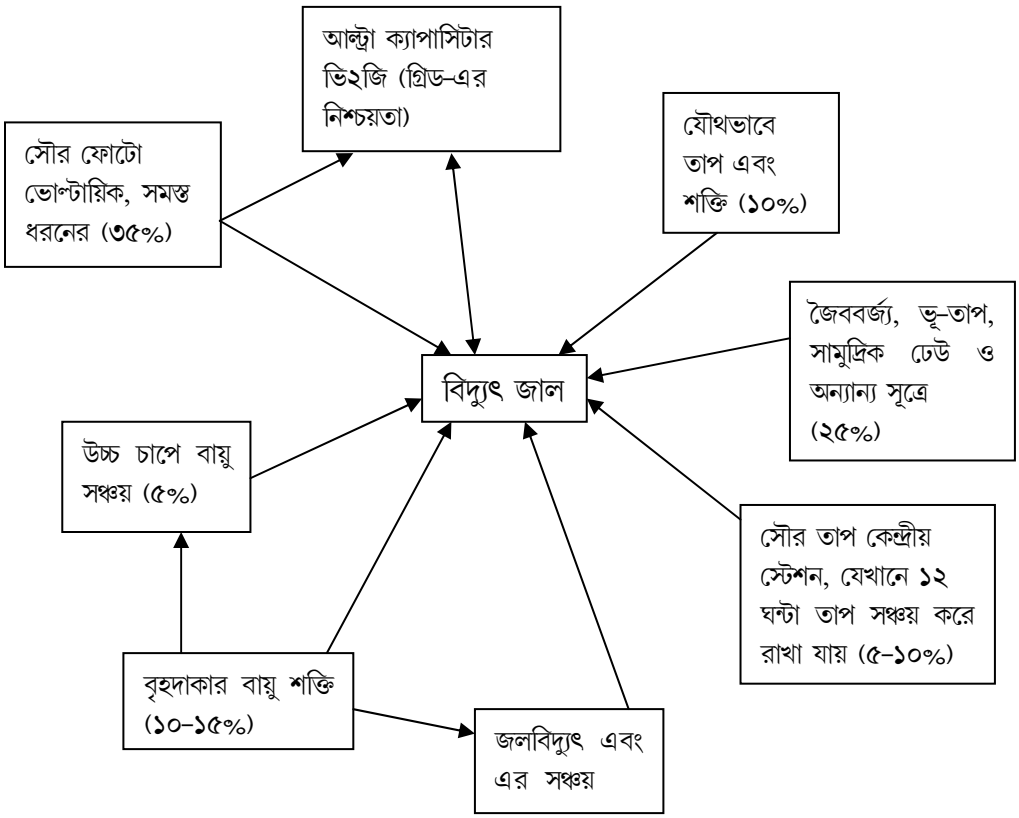

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলি-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
E-mail : jiten_nandi@vsnl.net, Telephone No. 2491-3666

উচ্চ-প্রশংসিত খাদ্য বিষয়ক লেখক মাইকেল পোলান কয়েক বছর আগে লিখেছিলেন, আধুনিক ফ্যাকট্রি খামারের অবস্থা — যেখানে হাজার হাজার মুরগি, শুয়োর আর গরুকে একসঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে — তাঁকে মধ্যযুগীয় শহরগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। গাদাগাদি করা, নোংরা আর দুর্গন্ধময় এইসব ফ্যাকট্রি খামার রোগের উৎপত্তি আর বিস্তারলাভের পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে অধিক রোগবাহী E. coli (যা ১৯৮০-র দশকে গোবরের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল) আর H5N1(মারণ এভিয়ান ফ্লু, যা ২০০৩ সাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে)। ফ্যাকট্রি খামার থেকে একইভাবে পশু ও মানুষের মধ্যে শ্বাসজনিত অসুখ হতে পারে। আর এইসব জায়গায় অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহারের কারণে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলি এক বড়ো অপরাধী।

সোমবার ইউনাইটেড নেশন্‌স ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO) তাদের পক্ষে অবাক করার মতোই এক ভবিষ্যদ্বাণী করে — এইসব সমস্যা আরও খারাপের দিকে যাবে, কারণ মানুষ ও পালিত পশুর সংখ্যা বাড়ছে আর আমাদের মাংসের খিদেও বেড়ে চলেছে। এখন বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক বাস করে শহরাঞ্চলে আর দ্রুতই সেগুলি ফ্যাকট্রি খামারের গন্তব্য হয়ে উঠছে, বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে। ২০০৬ সালে মাংস উৎপাদন আড়াই শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ২৭৬০ লক্ষ টন আর তা ২০০৭-এ আরও ৩ শতাংশ বেড়ে ২৮৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে।

FAO-এর মতে, শিল্পগত পশুচাষের মধ্যে শুয়োর ও পোলট্রি হল দ্রুততম বেড়ে ওঠা ক্ষেত্র — শুয়োরের মাংসের উৎপাদন বেড়েছে ২.৬% আর পোলট্রি-উৎপাদন বেড়েছে ৩.৭%, শুধুমাত্র গত এক দশকে। আর যেহেতু আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে এইসব পশুবাণিজ্য চলেছে, রোগের বিপদ বাড়ছে।

অতীতে FAO, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা নানান কারণে শিল্পগত পশুচাষ বৃদ্ধিতে উৎসাহদান করেছে। একটি কারণ হল, কৃষিতে বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আশির্বাদ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, এইসব সংগঠন বিশ্বাস করত, অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে এবং নিয়ন্ত্রিত তাপ ও আলোর ব্যবস্থায় গৃহমধ্যে পশু পালন করলে তারা রোগের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ক্রমাগত বেশি বেশি প্রামাণিক তথ্য কিছু রোগের প্রসারের উৎকেন্দ্র হিসেবে ফ্যাকট্রি খামারের দিকেই আঙুল তুলছে।

এখনকার মতো অন্তত দেখা যাচ্ছে, FAO তার সুর হয়ত পাল্টাচ্ছে। FAO-এর লাইভস্টক পলিসি এক্সপার্ট জোয়াসিম ওটে বলেন, "বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত পশুর চাপ পরিহার করা উচিত এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য উচ্চ বায়োসিকিউরিটি ও উন্নত রোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকল্পে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা দরকার"। ছোটো ছোটো খামার, আরও জিনগত বৈচিত্র্য এবং একইসঙ্গে খামারের শ্রমিক ও পশুদের জন্য আরও মানবিক ব্যবস্থা হয়ত রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো পথ হতে পারে।

ড্যানিয়েল নিরেনবার্গ, গবেষক, ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইন্সটিট্যুট, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭

৩. বিষয় : তসলিমা নাসরিন প্রসঙ্গ

সম্পাদক, মন্থন

মান্যবরেষু,

আপনার পত্রিকায় (নভেম্বর–ডিসেম্বর ২০০৮) প্রকাশিত দুটি রচনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করি।

প্রথম মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার লেখা। আমাদের মনে হয়, তসলিমা নাসরিনের মতো ব্যক্তির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবনে তিনি সর্বতোভাবেই অনুপযুক্ত! 'কূপমণ্ডুক' তার কুয়োটাকেই জগৎ বলে মনে করে। মনীষা একজন শিক্ষয়িত্রী ও লেখিকা। আমাদের বিবেচনায় তিনি এই দুটি কাজে সবিশেষ পারঙ্গম নন! শিক্ষিকারও সংযম প্রয়োজন। তাঁর অভিযোগ, তসলিমা প্রফেটকে 'গালমন্দ' করেছেন। দুরভাগ্যবশত, বর্তমান পত্রলেখক 'হিন্দু' — অন্তত সমাজের বিবেচনায়। বিশ্বের কোনও ধর্মই সত্য নয়! ধর্ম 'আফিম'–এর সমতুল্য, একথা উচ্চারিত হবার অনেক আগেই পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য 'ধর্ম' বা ঈশ্বর সম্পর্কে বহু 'বিজ্ঞানসম্মত' — জড়বাদী দার্শনিকের বা বৈজ্ঞানিকের — কথা শুনেছে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্স নগরীর বলেন, "... the notion of God and of a future life of reward and punishment were invented by shrewed men as devices of obedience to the laws."

'রেনেসাঁস' পরবর্তী পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হবস বলেন, "Religions are only superstitions in fashions." আর বেকন বলেন, "It is better to have no god at all than a bad one." শেষপর্যন্ত বিংশ শতকের প্রখ্যাত নাট্যকার Jean Anomith বলেন, "God is on everyone's side and in the last analysis he is on the side with plenty of money and large armies."

আর আমরা বলি, ঈশ্বর মানুষের অনুজ হলেও তিনি অতিবৃহৎ, তাঁকে চিরতরে নির্বাসন দেওয়াই জড়বাদীদের কাজ। তসলিমা শেষ বিচারে জড়বাদী বলেই আমরা তাঁকে জানি। গ্যালিলিও এবং ব্রুনোকেও 'শয়তানের বাচ্চা' ইত্যাদি গালমন্দ করা হয়। সুতরাং ঘোরতর ধর্মবিদ্বেষী তসলিমাকেও অকথ্য সামাজিক পীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে। ধর্মদ্রোহী হওয়া তো ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। দ্বন্দ্বের মারফতই মানুষ

তথা সমাজ এগিয়ে চলে। জড়ের বিরুদ্ধে অজড়ের সংগ্রাম চলছে অহর্নিশ। শ্যাওলায় হাঁটা যায় না কেন? দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না বলে, পথ বন্ধুর বলেই চরৈবেতি! জড়বাদকে ভাববাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবার হাতিয়ার বলেই মার্ক্সবাদের ছাত্ররা মনে করে। সমাজের গঠন, আইন তথা বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, ধর্ম সবই ধনপতিদের স্বার্থে গড়া — একথা ইতিহাসসম্মত, আমাদের মনগড়া নয়। একারণে ধর্মহীনেরাই ইতিহাস তৈরি করে। ধর্মপ্রাণেরা নয়, ধূর্ত মানুষেরাই মহম্মদকে নির্দোষ, নিষ্কলনহ শাসক বলে রটনা করে। রটনা করে শ্রীরাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা পুরুষ প্রকৃতির লীলা, বা একালে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের সাথে বাক্যালাপ করেন, বা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দৈবশক্তির কথা, যিশু খৃষ্টের সমাজ বৈপ্লবিক অবদান কার্যত ভুলে গিয়ে কপট নারী টেরেজাদের আদি পুরুষ বলে প্রচার করে ধূর্ততা! আমরা বিস্মিত হই না একালে শ্মশ্রুধারীদের তর্জন গর্জনে 'ভোট ভিখারি' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা অন্যান্যরা সেই ধর্মান্ধ, সমাজবিরোধী, রক্ষণশীলতার চরম কদাকার রূপ 'ধর্মপ্রাণ' অনুগামীদের সঙ্গে সংবাদপত্রে ছবি ছাপান। নেহরু রাজবংশের নিকৃষ্টতম উপহার তথা স্থূলমানের বিদূষক অন্তবাসীদের সাথে যখন নৈশভোজ সম্পন্ন করেন, তখন তা সংবাদপত্র পাঠকদের জানানো হয় — এতেও আমরা বিস্মিত হই না। মন্থনে প্রকাশিত আলোচ্য দুটি লেখা সম্পর্কে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে এই প্রাককথন আমাদের বিবেচনায় দরকার।

কোন এক মুসলিম ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, "মা দুর্গাকে অসৎ চরিত্র বললে আপনি সহ্য করবেন?" এই প্রশ্ন কোন ধীমান ব্যক্তি করবেন না। কারণ প্রফেট ঐতিহাসিক, মা দুর্গা মিথ। মহম্মদের কলঙ্ক ইতিহাসসম্মত, তা প্রামাণ্য পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়।